স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা

ভক্তিযোগ

স্বামী বিবেকানন্দ

BENGALIEBOOK.COM
2021

সূচিপত্র

১. ভক্তির লক্ষণ........2
২. ঈশ্বরের স্বরূপ........9
৩. প্রত্যাক্ষানুভূতিই ধর্ম........1 6
৪. গুরুর প্রয়োজনীয়তা........1 9
৫. গুরু ও শিষ্যের লক্ষণ........2 2
৬. অবতার........2 8
৭. মন্ত্র........3 2
৮. প্রতীক ও প্রতিমা-উপাসনা........3 5
৯. ইষ্টনিষ্ঠা........3 8
১০. ভক্তির সাধন........4 1

১. ভক্তির লক্ষণ

অকপটভবে ঈশ্বরানুসন্ধানই ভক্তিযোগ; প্রীতি ইহার আদি, মধ্য ও অন্ত। মুহূর্তস্থায়ী ভগবৎ-প্রেমোন্মত্ততা হইতেও শাশ্বতী মুক্তি আসিয়া থাকে। নারদ তদীয় 'ভক্তিসূত্র'-এ বলিয়াছেন, 'ভগবানে পরম প্রেমই ভক্তি।' 'ইহা লাভ করিলে জীব সর্বভূতে প্রেমবান্ ও ঘৃণাশূন্য হয় এবং অনন্তকালের জন্য তৃপ্তি লাভ করে।' 'এই প্রেমের দ্বারা কোন কাম্য বস্তু লাভ হইতে পারে না, কারণ বিষয়বাসনা থাকিতে এই প্রেমের উদয়ই হয় না।' 'কর্ম, জ্ঞান এবং যোগ হইতেও ভক্তি অধিকতরা, কারণ সাধ্যবিশেষই উহাদের লক্ষ্য, কিন্তু ভক্তি স্বয়ংই সাধ্য ও সাধনস্বরূপা।' ১

আমাদের দেশের সকল মহাপুরুষই ভক্তিতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন। শাণ্ডিল্য, নারদাদি ভক্তিতত্ত্বের বিশেষ ব্যাখ্যাতাগণকে ছাড়িয়া দিলেও স্পষ্টতঃ জ্ঞানমার্গ-সমর্থনকারী ব্যাসসূত্রের মহান্ ভাষ্যকারও ভক্তিসম্বন্ধে অনেক ইঙ্গিত করিয়াছেন। সমুদয় না হউক, অধিকাংশ সূত্রই শুষ্কজ্ঞানসূচক অর্থে ব্যাখ্যা করিবার আগ্রহ ভাষ্যকারের থাকিলেও সূত্রগুলির—বিশেষতঃ উপাসনা-বিষয়ক সূত্রগুলির অর্থ নিরপেক্ষভাবে অনুসন্ধান করিলে সহজে তাহাদের ঐরূপ ব্যাখ্যা চলিতে পারে না।

সাধারণতঃ লোকে জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে যতটা পার্থক্য আছে মনে করে, বাস্তবিক তাহা নাই। ক্রমশঃ বুঝিব, জ্ঞান ও ভক্তি শেষে একই লক্ষ্যে মিলিত হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ জুয়াচোর ও গুপ্তবিদ্যার নামে ছলনাকারীদের হাতে পড়িয়া রাজযোগ প্রায়ই অসাবধান ব্যক্তিদের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। এরূপ না হইয়া মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইলে রাজযোগও সেই একই লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দেয়।

ভক্তিযোগে এক বিশেষ সুবিধা—উহা আমাদের চরম লক্ষ্য ঈশ্বরে পৌঁছিবার সর্বাপেক্ষা সহজ ও স্বাভাবিক পন্থা। কিন্তু উহাতে বিশেষ বিপদাশঙ্কা এই যে, নিম্নস্তরের ভক্তি অনেক সময়ে ভয়ানক গোঁড়ামির আকার ধারণ করে। হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্ট-ধর্মান্তর্গত গোঁড়ার

দল—এই নিম্নস্তরের ভক্তিসাধকগণের মধ্যেই সর্বদা বিশেষ ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। যে ইষ্টনিষ্ঠা ব্যতীত প্রকৃত প্রেম জন্মে না, সেই ইষ্টনিষ্ঠাই আবার অনেক সময় অন্য সকল মতের উপর তীব্র আক্রমণ ও দোষারোপের কারণ। সকল ধর্মের ও সকল দেশের দুর্বল অপরিণতমস্তিষ্ক ব্যক্তিগণ একটিমাত্র উপায়েই তাহাদের নিজ আদর্শ ভালবাসিতে পারে। সেই উপায়টি—অপর সমুদয় আদর্শকে ঘৃণা করা। নিজ ঈশ্বরাদর্শে, নিজ ধর্মাদর্শে একান্ত অনুরক্ত ব্যক্তিগণ অন্য কোন আদর্শের বিষয় শুনিলে বা দেখিলে কেন গোঁড়ার মত চীৎকার করিতে থাকে, তাহার কারণ ইহা হইতেই বুঝা যায়। এরূপ ভালবাসা যেন প্রভুর সম্পত্তিতে অপরের হস্তক্ষেপ-নিবারণের জন্য কুকুর-সুলভ সহজ প্রবৃত্তির মত। তবে প্রভেদ এই—কুকুরের এই সহজ প্রবৃত্তি মানবযুক্তি অপেক্ষা উচ্চতর; প্রভু যে বেশ ধরিয়াই আসুন না কেন, কুকুর তাঁহাকে কখনও শত্রু বলিয়া ভুল করে না। গোঁড়া কিন্তু সমুদয় বিচার শক্তি হারাইয়া ফেলে। ব্যক্তিগত বিষয়ে তাহার দৃষ্টি এত অধিক যে, কোন ব্যক্তি কি বলিতেছে, তাহা সত্য কি মিথ্যা, তাহা শুনিবার বা বুঝিবার কোন প্রয়োজন সে বোধ করে না: কিন্তু কে উহা বলিতেছে, সেই বিষয়েই তাহার বিশেষ দৃষ্টি। যে-লোক স্বমতাবলম্বী ব্যক্তিগণের উপর দয়াশীল, ন্যায়পরায়ণ ও প্রেমযুক্ত, সে-ই নিজ সম্প্রদায়ের বহির্ভূত ব্যক্তিদের অনিষ্ট করিতে ইতস্ততঃ করে না।

তবে এ আশঙ্কা কেবল ভক্তির নিম্নস্তরেই আছে—এই অবস্থার নাম 'গৌণী'। উহা পরিপক্ব হইয়া পরাভক্তিতে পরিণত হইলে আর এরূপ ভয়ানক গোঁড়ামি আসিবার আশঙ্কা থাকে না। এই পরাভক্তির প্রভাবে সাধক প্রেমস্বরূপ ভগবানের এত নিকটতা লাভ করেন যে, তিনি আর অপরের প্রতি ঘৃণার ভাব বিস্তার করিবার যন্ত্রস্বরূপ হইতে পারেন না।

এই জীবনেই যে আমরা সকলে সামঞ্জস্যের সহিত চরিত্র গড়িয়া তুলিতে পারিব, তাহা সম্ভব নয়; তবে আমরা জানি—যে-চরিত্রে জ্ঞান ভক্তি ও যোগ সমন্বিত হইয়াছে, সেই চরিত্রই সর্বাপেক্ষা মহৎ। উড়িবার জন্য পাখির তিনটি জিনিষের আবশ্যক—দুইটি পক্ষ ও চালাইবার হালস্বরূপ একটি পুচ্ছ। জ্ঞান ও ভক্তি দুইটি পক্ষ, সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য যোগ উহার পুচ্ছ। যাঁহারা এই তিনপ্রকার সাধন-প্রণালী একসঙ্গে সামঞ্জস্যের সহিত

অনুষ্ঠান করিতে না পারিয়া ভক্তিকেই একমাত্র পথ বলিয়া গ্রহণ করেন, তাঁহাদের পক্ষে এটি সর্বদা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, বাহ্য অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপ প্রথম অবস্থায় সাধকের পক্ষে অত্যাবশ্যক হইলেও ভগবানের প্রতি প্রগাঢ় প্রেমের অবস্থায় আগাইয়া দেওয়া ব্যতীত এগুলির আর কোন উপযোগিতা নাই।

জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গের আচার্যগণের মধ্যে সামান্য একটু মতভেদ আছে, যদিও উভয়েই ভক্তির প্রভাবে বিশ্বাসী। জ্ঞানীরা ভক্তিকে মুক্তির উপায়মাত্র বলিয়া বিশ্বাস করেন, কিন্তু ভক্তেরা উহাকে উপায় ও উদ্দেশ্য—একাধারে দুই-ই মনে করিয়া থাকেন। আমার বোধ হয়, এ প্রভেদ নামমাত্র। প্রকৃতপক্ষে ভক্তিকে সাধন-স্বরূপ ধরিলে নিম্নস্তরের উপাসনামাত্র বুঝায়, আর একটু অগ্রসর হইলে এই নিম্নস্তরের উপাসনাই উচ্চস্তরের ভক্তির সহিত অভিন্নভাব ধারণ করে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ সাধন-প্রণালীর উপর ঝোঁক দিয়া থাকেন। তাঁহারা ভুলিয়া যান—প্রকৃত জ্ঞান অযাচিত হইলেও পূর্ণ ভক্তির সহিত আসিবেই আসিবে, আর পূর্ণ জ্ঞানের সহিত প্রকৃত ভক্তিও অভিন্ন।

এইটি মনে রাখিয়া বুঝিবার চেষ্টা করা যাক—এ বিষয়ে বেদান্তের মহান্ ভাষ্যকারেরা কি বলেন। 'আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ'—এই সূত্র ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ভগবান্ শঙ্কর বলেন, 'লোকে এইরূপ বলিয়া থাকে—অমুক গুরুর ভক্ত, অমুক রাজার ভক্ত। যে গুরুর বা রাজার নির্দেশানুবর্তী হয় এবং নির্দেশানুবর্তনকেই একমাত্র লক্ষ্য রাখিয়া কার্য করে, তাহাকেই ভক্ত বলিয়া থাকে। লোকে আরও এইরূপ বলিয়া থাকে—পতিপ্রাণা স্ত্রী বিদেশগত পতির ধ্যান করিতেছে। এখানেও একরূপ সাগ্রহ অবিচ্ছিন্ন স্মৃতিই লক্ষিত হইয়াছে।'২ শঙ্করের মতে ইহাই ভক্তি।

আবার ভগবান্ রামানুজ 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' সূত্রের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেনঃ

'এক পাত্র হইতে অপর পাত্রে নিক্ষিপ্ত অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় প্রবাহিত ধ্যেয় বস্তুর নিরন্তর স্মরণের নাম ধ্যান। যখন ভগবৎ-সম্বন্ধে এইরূপ অবিচ্ছিন্ন স্মৃতির অবস্থা লব্ধ হয়, তখন সকল বন্ধন নাশ হয়।' এইরূপে শাস্ত্র এই নিরন্তর স্মরণকে মুক্তির কারণ

বলিয়াছেন। এইরূপ স্মরণ আবার দর্শন করারই সামিল। কারণ ‘সেই পর ও অবর (দূর ও সন্নিহিত) পুরুষকে দর্শন করিলে হৃদয়গ্রন্থি নাশ হয়, সমুদয় সংশয় ছিন্ন হইয়া যায় এবং কর্মক্ষয় হইয়া যায়।’—এই শাস্ত্রোক্ত বাক্যে ‘স্মরণ’ দর্শনের সহিত সমার্থকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। যিনি সন্নিহিত, তাঁহাকে দর্শন করা যাইতে পারে; কিন্তু যিনি দূরবর্তী, তাঁহাকে কেবল স্মরণ করা যাইতে পারে; তথাপি শাস্ত্র আমাদিগকে সন্নিহিত ও দূরস্থ উভয়কেই দর্শন করিতে বলিতেছেন, সুতরাং ঐরূপ স্মরণ ও দর্শন এক পর্যায়ের কার্য বলিয়া সূচিত হইল। এই স্মৃতি প্রগাঢ় হইলে দর্শনের তুল্য হইয়া পড়ে। ... আর উপাসনা-অর্থে সর্বদা স্মরণ, ইহা শাস্ত্রের প্রধান প্রধান শ্লোক হইতে দৃষ্ট হয়। জ্ঞান—যাহা নিরন্তর উপাসনার সহিত অভেদ, তাহাও নিরন্তর স্মরণ-অর্থে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ... সুতরাং স্মৃতি যখন প্রত্যক্ষানুভূতির আকার ধারণ করে, তাহাই শাস্ত্রে মুক্তির উপায় বলিয়া কথিত হইয়াছে। ‘নানবিধ বিদ্যা দ্বারা, বুদ্ধি দ্বারা, কিংবা বহু বেদাধ্যয়নের দ্বারা আত্মা লভ্য নন। যাঁহাকে এই আত্মা বরণ করেন, তিনিই সেই আত্মাকে লাভ করেন, তাঁহার নিকটে আত্মা আপন স্বরূপ প্রকাশ করেন।’ এস্থলে প্রথমে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা আত্মা লব্ধ হন না বলিয়া পরে বলিতেছেন, ‘আত্মা যাঁহাকে বরণ করেন, তাঁহার দ্বারাই আত্মা লব্ধ হন’; অত্যন্ত প্রিয়কেই ‘বরণ’ করা সম্ভব। যিনি আত্মাকে অতিশয় ভালবাসেন, আত্মা তাঁহাকেই অতিশয় ভালবাসেন, এই প্রিয় ব্যক্তি যাহাতে আত্মাকে লাভ করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে ভগবান্ স্বয়ং তাঁহাকে সাহায্য করেন। কারণ ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন, ‘যাহারা নিরন্তর আমাতে আসক্ত এবং প্রেমের সহিত আমাকে উপাসনা করে, আমি তাহাদিগের বুদ্ধি এমনভাবে চালিত করি, যাহাতে তাহারা আমাকে লাভ করে।’৩ অতএব কথিত হইয়াছে যে, প্রত্যক্ষ-অনুভবাত্মক এই স্মৃতি যাঁহার অতি প্রিয় (উহা ঐ স্মৃতির বিষয়ীভূত পুরুষের অতি প্রিয় বলিয়া) তাঁহাকেই সেই পরমাত্মা বরণ করেন, তাঁহার দ্বারাই সেই পরমাত্মা লব্ধ হন। এই নিরন্তর স্মরণ ‘ভক্তি’ শব্দের দ্বারা লক্ষিত হইয়াছে।

পতঞ্জলির ‘ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা’ সূত্রটির ব্যাখ্যায় ভোজ বলেন—‘প্রণিধান- অর্থে সেইরূপ ভক্তি, যাহাতে সমুদয় ফলাকাঙ্ক্ষা (যেমন ইন্দ্রিয়ের ভোগাদি) ত্যক্ত হইয়া সমুদয় কর্ম সেই পরম গুরুর উপর সমর্পিত হয়।’৪ আবার ভগবান্ ব্যাস উহার ব্যাখ্যায় বলেন,

‘প্রণিধান-অর্থে ভক্তিবিশেষ, যদ্দ্বারা যোগীর নিকট সেই পরম পুরুষের কৃপার আবির্ভাব হয় এবং তাঁহার বাসনা সকল পূর্ণ হয়।’৫ শাণ্ডিল্যের মতে ‘ঈশ্বরে পরমানুরক্তিই ভক্তি।’৬ ভক্তরাজ প্রহ্লাদ কিন্তু ভক্তির যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহাই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ‘অজ্ঞলোকের ইন্দ্রিয়-বিষয়ে যেরূপ তীব্র আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়, তোমাকে স্মরণ করিবার সময় তোমার প্রতি সেইরূপ তীব্র আসক্তি যেন আমার হৃদয় হইতে অপসারিত না হয়।’৭ আসক্তি—কাহার জন্য? পরম প্রভু ঈশ্বরের জন্য। আর কাহাকেও ভালবাসা—তা তিনি যত বড়ই হউন না কেন, তাঁহাকে ভালবাসা কখনই ‘ভক্তি’ হইতে পারে না। ইহার প্রমাণ স্বরূপ রামানুজ শ্রীভাষ্যে এক প্রাচীন আচার্যের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন,—‘ব্রহ্মা হইতে ক্ষুদ্র তৃণ পর্যন্ত জগদন্তর্গত সকল প্রাণী কর্মহেতু জন্ম ও মৃত্যুর বশীভূত; তাহারা অবিদ্যার অন্তর্গত ও পরিবর্তনশীল বলিয়া সাধকের ধ্যানের সহায় নয়।’৮শাণ্ডিল্যসূত্রের ‘অনুরক্তি’ শব্দ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ব্যাখ্যাকার স্বপ্নেশ্বর বলেন, ‘উহার অর্থঃ অনু—পশ্চাৎ, ও রক্তি—আসক্তি অর্থাৎ ভগবানের স্বরূপ ও মহিমাজ্ঞানের পর তাঁহার প্রতি যে আসক্তি আসে।’৯ তাহা না হইলে যে-কোন ব্যক্তির প্রতি, যেমন স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি অন্ধ আসক্তিও ভক্তি হইয়া যায়। অতএব আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি, সাধারণ পূজাপাঠাদি হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশ্বরে প্রগাঢ় অনুরাগ পর্যন্ত আধ্যাত্মিক অনুভূতির জন্য চেষ্টাপরম্পরার নাম ভক্তি।

১ ওঁ সা কস্মৈ পরমপ্রেমরূপা। —নারদ-সূত্র, ১ম অনুবাক, ২য় সূত্র
ওঁ সা ন কাময়মানা নিরোধরূপত্বাৎ। —ঐ, ২।৭
ওঁ সা তু কর্মজ্ঞানযোগেভ্যোঽপ্যধিকতরা। —ঐ, ৪।২৫
ওঁ স্বয়ং ফলরূপতেতি ব্রহ্মকুমারাঃ। —ঐ, ৪।৩০

২ তথা হি লোকে গুরুমুপাস্তে ইতি চ যস্তাৎপর্যেণ গুর্বাদীননুবর্ততে স এবমুচ্যতে। তথা ধ্যায়তি প্রোষিতনাথা পতিমিতি বা নিরন্তরস্মরণা পতিং প্রতি সোৎকণ্ঠা সৈবমভিধীয়তে। —শাঙ্করভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র, ৪। ১। ১

৩ ধ্যানং তৈলধারাবদবিচ্ছিন্নস্মৃতিসন্তানরূপা ধ্রুবা স্মৃতিঃ। ‘স্মৃত্যুপলম্ভে সর্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ’ ইতি ধ্রুবায়াঃ স্মৃতেরপবর্গোপায়ত্বশ্রবণাৎ। সা চ স্মৃতির্দর্শনসমানাকারা; ‘ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে’ ইত্যনেনৈকার্থ্যাৎ এবং চ সতি ‘আত্মা বারে দ্রষ্টব্য’ ইত্যনেন নিদিধ্যাসনস্য দর্শনরূপতা বিধীয়তে। ভবতি চ স্মৃতের্ভাবনপ্রকর্ষাদ্দর্শনরূপতা। বাক্যকারেণৈতৎ সর্বং প্রপঞ্চিতম্। ‘বেদনমুপাসনম্’ স্যাৎ তদ্বিষয়ে শ্রবণাদিতি।’ সর্বাসূপনিষৎসু মোক্ষসাধনতয়া বিহিতং ‘বেদনমুপাসনম্’ ইত্যুক্তং ‘সকৃৎপ্রত্যয়ং কুর্যাচ্ছব্দার্থস্য কৃতত্বাৎ প্রযাজাদিবৎ’ ইতি পূর্বপক্ষং কৃত্বা ‘সিদ্ধং তূপাসনশব্দাৎ’ ইতি বেদনমসকৃদাবৃত্তং মোক্ষসাধনামিতি নির্ণীতম্। ‘উপাসনং স্যাদ্ ধ্রুবানুস্মৃতির্দর্শনান্নির্বচনাচ্চেতি’ তস্যৈব বেদনস্যোপাসনরূপস্যাসকৃদাবৃত্তস্য ধ্রুবানুস্মৃতিত্বমুপবর্ণিতম্। সেয়ং স্মৃতিদর্শনরূপা প্রতিপাদিতা, দর্শনরূপা চ প্রত্যক্ষতাপত্তিঃ। এবং প্রত্যক্ষতাপন্নামপবর্গসাধনভূতাং স্মৃতিং বিশিনষ্টি–‘নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্’ ইতি অনেন কেবলশ্রবণমননিদিধ্যাসনানামাত্মপ্রাপ্ত্যনুপায়তামুক্ত্বা ‘যমবৈষ বৃণুতে তেনৈব লভ্যঃ’ ইত্যুক্তম্। প্রিয়তম এব হি বরণীয়ো ভবতি, যস্যায়ং নিরতিশয়প্রিয়ঃ স এবাস্য প্রিয়তমো ভবতি। যথায়ং প্রিয়তম আত্মানং প্রাপ্নোতি, তথা স্বয়মেব ভগবান্ প্রযতত ইতি ভগবতৈবোক্তং–‘তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকং। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে’ ইতি ‘প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ’ ইতি চ। অতঃ সাক্ষাৎকাররূপা স্মৃতিঃ স্মর্যমাণাত্যর্থপ্রিয়ত্বেন স্বয়মপ্যত্যর্থপ্রিয়া যস্য স এব পরমাত্মনা বরণীয়ো ভবতীতি তেনৈব লভ্যতে পরমাত্মেত্যুক্তং ভবতি, এবং রূপা ধ্রুবানুস্মৃতিরেব ভক্তিশব্দেনাভিধীয়তে।

–রামানুজভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র, ১।১।১

৪ প্রণিধানং তত্র ভক্তিবিশেষো বিশিষ্টমুপাসনং সর্বক্রিয়াণামপি তত্রার্পণং। বিষয়সুখাদিকং ফলমনিচ্ছন্ সর্বাঃ ক্রিয়াস্তস্মিন্ পরমগুরাবর্পয়তি।

–ভোজবৃত্তি, পাতঞ্জল যোগসূত্র, ১।২৩

৫ ‘প্রণিধানাদ্ভক্তিবিশেষাদাবর্জিত ঈশ্বরস্তমনুগৃহাত্যভিধ্যানমাত্রেণ’ ইত্যাদি।

৬ ‘সা পরানুরক্তিরীশ্বরে’ –শাণ্ডিল্যসূত্র, ১। ২

৭ যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েম্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু।।
–বিষ্ণুপুরাণ, ১। ২০। ১৯

৮ আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্তা জগদন্তর্ব্যবস্থিতাঃ।
প্রাণিনঃ কর্মজনিতসংসারবশবর্তিনঃ।।
যতস্ততো ন তে ধ্যানে ধ্যানিনামুপকারকাঃ।
অবিদ্যান্তর্গতাঃ সর্বে তে হি সংসারগোচরাঃ। ।

৯ ভগবন্মহিমাদিজ্ঞানাদনু পশ্চাজ্জায়মানত্বাদনুরক্তিরিত্যুক্তম্।
–স্বপ্নেশ্বরটীকা, শাণ্ডিল্যসূত্র ১। ২

২. ঈশ্বরের স্বরূপ

ঈশ্বর কে? 'যাঁহা দ্বারা জন্ম, স্থিতি ও লয় হইতেছে'১০ তিনি ঈশ্বর–'অনন্ত, শুদ্ধ, নিত্যমুক্ত, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, পরমকারুণিক, গুরুর গুরু।'১১ আর সকলের উপর 'তিনি অনির্বচনীয় প্রেমস্বরূপ।' ১২

এগুলি অবশ্য সগুণ ঈশ্বরের সংজ্ঞা। তবে কি ঈশ্বর দুইটি? 'নেতি নেতি' করিয়া জ্ঞানী যে সচ্চিদানন্দে উপনীত হন, তিনি একটি এবং ভক্তের প্রেমময় ভগবান্ আর একটি? না, সেই একই সচ্চিদানন্দ–প্রেমময় ভগবান্, একাধারে তিনি সগুণ ও নির্গুণ। সর্বদাই বুঝিতে হইবে, ভক্তের উপাস্য সগুণ ঈশ্বর, ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বা পৃথক্ নন। সবই সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্ম'। তবে নির্গুণ পরব্রহ্মের এই নির্গুণ স্বরূপ অতি সূক্ষ্ম বলিয়া প্রেম বা উপাসনার পাত্র হইতে পারেন না। এইজন্য ভক্ত ব্রহ্মের সগুণ ভাব অর্থাৎ পরমনিয়ন্তা ঈশ্বরকে উপাস্যরূপে নির্বাচন করেন। একটি উপমার দ্বারা বুঝা যাকঃ

ব্রহ্ম যেন মৃত্তিকা বা উপাদান–তাহা হইতে অনেক বস্তু নির্মিত হইয়াছে। মৃত্তিকারূপে ঐগুলি এক বটে, কিন্তু রূপ বা প্রকাশ উহাদিগকে পৃথক্ করিয়াছে। উৎপত্তির পূর্বে তাহারা ঐ মৃত্তিকাতেই অব্যক্তভাবে ছিল। উপাদান হিসাবে এক, কিন্তু যখন বিশেষ বিশেষ রূপ ধারণ করে, আর যতদিন সেই রূপ থাকে, ততদিন সেগুলি পৃথক্ পৃথক্। মাটির ইঁদুর কখনও মাটির হাতি হইতে পারে না। কারণ আকার গ্রহণ করিলে বিশেষ আকৃতিই বস্তুর বিশেষত্বের জ্ঞাপক। বিশেষ কোন আকৃতিহীন মৃত্তিকা হিসাবে অবশ্য উহারা একই। ঈশ্বর সেই পূর্ণ সত্যস্বরূপের উচ্চতম অভিব্যক্তি অথবা মনুষ্যমনের সর্বোচ্চ উপলব্ধি। সৃষ্টি অনাদি, ঈশ্বরও অনাদি। বেদান্তসূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে মুক্তাত্মা যে প্রায়-অনন্ত শক্তি ও জ্ঞানের অধিকারী হয়, তাহা বর্ণন করিয়া ব্যাস আর একটি সূত্রে বলিতেছেন, 'কিন্তু কেহই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের শক্তিলাভ করিবে না, তাহা কেবল ঈশ্বরের।'১৩ এই সূত্রব্যাখ্যার সময় দ্বৈতবাদী ভাষ্যকারগণ পরতন্ত্র জীবের পক্ষে ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি ও পূর্ণ স্বতন্ত্রতা লাভ করা যে কোন কালে সম্ভব নয়, তাহা অনায়াসে

দেখাইতে পারেন। পূর্ণ দ্বৈতবাদী ভাষ্যকার মধ্বাচার্য বরাহপুরাণ হইতে একটি শ্লোক তুলিয়া তাঁহার প্রিয় সংক্ষিপ্ত উপায়ে এই সূত্রটির ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এই সূত্র ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বিশিষ্টাদ্বৈত-ভাষ্যকার রামানুজ বলেনঃ

সংশয় উপস্থিত হয় যে, মুক্তাত্মাদিগের শক্তির মধ্যে পরম পুরুষের অসাধারণ শক্তি অর্থাৎ জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়শক্তি ও সর্বনিয়ন্তৃত্ব অন্তর্ভুক্ত কিনা? অথবা উহার অভাবে পরম পুরুষের সাক্ষাৎ দর্শনই কেবল তাঁহাদের ঐশ্বর্য কিনা? মুক্তাত্মা জগতের নিয়ন্তৃত্ব লাভ করেন, ইহা যুক্তিযুক্ত মনে করা যাক। কেন? কারণ শ্রুতি বলেন, 'মুক্তাত্মা পরম একত্ব লাভ করেন' (মুণ্ডক উপনিষদ্, ৩।১।৩)। আরও উক্ত হইয়াছে, 'তাঁহার সমুদয় বাসনা পূর্ণ হয়'। এখন কথা এই, পরম একত্ব ও সকল বাসনার পরিপূরণ পরম পুরুষের অসাধারণ শক্তি-জগন্নিয়ন্তৃত্ব ব্যতীত হইতে পারে না। অতএব সকল বাসনার পরিপূরণ ও পরম একত্ব লাভ হয় বলিলেই মানিতে হইবে, মুক্তাত্মা সমগ্র জগতের নিয়ন্তৃত্বও লাভ করেন। ইহার উত্তরে আমরা বলি, মুক্তাত্মা কেবল জগন্নিয়ন্তৃত্ব ব্যতীত আর সমুদয় শক্তিলাভ করেন। 'জগন্নিয়মন' অর্থে—জগতের সমুদয় স্থাবর জঙ্গমের বিভিন্ন প্রকার রূপ, স্থিতি ও বাসনার নিয়ন্তৃত্ব। মুক্তাত্মাদিগের কিন্তু এই জগন্নিয়মন—শক্তি নাই, যাহা কিছু ঈশ্বরের স্বরূপ আবৃত করে, তাঁহাদের দৃষ্টিপথ হইতে সে-সকল আবরণ চলিয়া গিয়াছে এবং তাঁহাদের প্রত্যক্ষ ব্রহ্মানুভূতি হয়—ইহাই তাঁহাদের একমাত্র ঐশ্বর্য। ইহা কিরূপে জানিলে? নিখিল-জগন্নিয়ন্তৃত্ব কেবল পরব্রহ্মেরই গুণ বলিয়া যে শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, সেই শাস্ত্রবাক্যবলেই ইহা জানিয়াছি। 'যাঁহা হইতে সমুদয় বস্তু জন্মায়, যাঁহাতে অবস্থান করে এবং যাঁহাতে প্রলয়কালে প্রবেশ করে, তাঁহার সম্বন্ধে জানিবার ইচ্ছা কর, তিনি ব্রহ্ম।'—(তৈত্তি. উপ., ৩।১)। যদি এই জগন্নিয়ন্তৃত্ব মুক্তাত্মাদেরও সাধারণ গুণ হয়, তবে উদ্ধৃত শ্লোক ব্রহ্মের লক্ষণ হইতে পারে না, কারণ তাঁহার নিয়ন্তৃত্ব-গুণের দ্বারা তাঁহার লক্ষণ করা হইয়াছে। অসাধরণ গুণগুলিকেই বিশেষ লক্ষণ বলা হয়। অতএব নিম্নোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যসমূহে পরমপুরুষকেই জগন্নিয়মনের কর্তারূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, আর ঐ ঐ স্থলে মুক্তাত্মার এমন বর্ণনা নাই, যাহাতে জগন্নিয়ন্তৃত্ব তাঁহাদের উপর আরোপিত

হইতে পারে। বেদবাক্যগুলি এইঃ 'বৎস, আদিতে একমেবাদ্বিতীয়ম্ ছিলেন। তিনি আলোচনা করিলেন আমি বহু সৃষ্টি করিব। তিনি তেজ সৃজন করিলেন। কেবল ব্রহ্মই আদিতে ছিলেন। তিনি পরিণত হইলেন। তিনি ক্ষত্র নামে এক সুন্দর রূপ সৃজন করিলেন। বরুণ, সোম, রুদ্র, পর্জন্য, যম, মৃত্যু, ঈশান এই-সকল দেবতাই ক্ষত্র।' 'আদিতে আত্মাই ছিলেন। ক্রিয়াশীল আর কিছুই ছিল না। তিনি আলোচনা করিলেন, আমি জগৎ সৃষ্টি করিব—পরে তিনি এই জগৎ সৃজন করিলেন।' 'একমাত্র নারায়ণই ছিলেন। ব্রহ্ম, ঈশান, দ্যাবা-পৃথিবী, তারা, জল, অগ্নি, সোম কিংবা সূর্য—কিছুই ছিল না, তিনি একাকী সুখী হইলেন না। ধ্যানের পর তাঁহার একটি কন্যা ও দশ ইন্দ্রিয় জন্মিল।' 'যিনি পৃথিবীতে বাস করিয়া পৃথিবী হইতে স্বতন্ত্র', 'যিনি আত্মাতে বাস করিয়া' ইত্যাদি।১৪

পরসূত্র-ব্যাখ্যায় রামানুজ বলিতেছেন, 'যদি বল ইহা সত্য নয়, কারণ বেদে ইহার বিপরীতার্থপ্রতিপাদক অনেক শ্লোক আছে, তাহা হইলে বলিব—তাহা নিম্নদেবলোকে মুক্তাত্মার ঐশ্বর্য-বর্ণনা মাত্র।'১৫ ইহাও একরূপ সহজ মীমাংসা হইল।যদিও রামানুজের মতে সমষ্টির ঐক্য স্বীকৃত হইয়াছে, তথাপি তাঁহার মতে এই সমষ্টির মধ্যে নিত্য ভেদসমূহ আছে। অতএব এই মতও কার্যতঃ দ্বৈত বলিয়া জীবাত্ম ও সগুণ ঈশ্বরের স্পষ্ট ভেদ রক্ষা করা রামানুজের পক্ষে সহজ হইয়াছে।

এখন আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব, অদ্বৈতমতের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা এই বিষয়ে কি বলেন। আমরা দেখিব, অদ্বৈতমত কেমন দ্বৈতবাদীর সকল আশা- আকাঙ্ক্ষা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সঙ্গে সঙ্গে মানবজাতির মহোচ্চ দিব্যভাবের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া নিজ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতেছেন। যাঁহারা মুক্তিলাভের পরও নিজ নিজ ব্যক্তিত্ব রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, ভগবান্ হইতে স্বতন্ত্র থাকিতে চান, তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার ও সগুণ ব্রহ্মকে সম্ভোগ করিবার যথেষ্ট অবসর থাকিবে। ইঁহাদেরই কথা ভাগবত-পুরাণে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছেঃ 'হে রাজন্, হরির এতাদৃশ গুণরাশি যে, যে-সকল মুনি আত্মারাম, যাঁহাদের সকল বন্ধন চলিয়া গিয়াছে, তাঁহারও ভগবানের প্রতি অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন।১৬

সাংখ্যেরা ইঁহাদিগকে ‘প্রকৃতিলীন’ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সিদ্ধিলাভ করিয়া ইঁহারা পরকল্পে কতকগুলি জগতের শাসনকর্তারূপে আবির্ভূত হন। কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে কেহ কখনই ঈশ্বরতুল্য হইতে পারেন না। যাঁহারা এমন এক অবস্থায় উপনীত হন, যেখানে সৃষ্টি সৃষ্ট বা স্রষ্টা নাই, যেখানে জ্ঞাতা জ্ঞেয় বা জ্ঞান নাই, ‘সেখানে কে কাহাকে দেখে?’—এরূপ ব্যক্তি সমুদয়ের বাহিরে গিয়াছেন, যাহাকে শ্রুতি ‘নেতি, নেতি’ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা এরূপ অবস্থা লাভ করিতে পারেন না বা এরূপ অবস্থায় যাইতে ইচ্ছা করেন না, তাঁহারা সেই এক অবিভক্ত ব্রহ্মকে প্রকৃতি, আত্মা, এবং ঐ উভয়ের অন্তর্যামী ঈশ্বর—এই তিনরূপে বিভক্ত দেখিবেন। ভক্তির আতিশয্যে চেতনার ঊর্ধ্বতর স্তরে যখন প্রহ্লাদ নিজেকে ভুলিয়া গেলেন, তখন তিনি জগৎ ও তাঁহার কারণ—কিছুই তো দেখিতে পাইলেন না, সমুদয়ই তাঁহার নিকট নাম-রূপ দ্বারা বিভক্ত নয়—এমন এক অনন্তরূপে প্রতীয়মান হইয়াছিল। কিন্তু যখনই তাঁহার বোধ হইল—তিনি প্রহ্লাদ, অমনি তাঁহার নিকট জগৎ ও অশেষকল্যাণগুণরাশির আধারস্বরূপ জগদীশ্বর প্রকাশিত হইলেন। মহাভাগা গোপীদিগেরও এই অবস্থা ঘটিয়াছিল। যতক্ষণ তাঁহারা কৃষ্ণের প্রতি গভীর অনুরাগে ও প্রেমে অহংজ্ঞানশূন্য ছিলেন, ততক্ষণ তাঁহারা সকলেই কৃষ্ণরূপে পরিণত হইয়াছিলেন। যখন তাঁহারা কৃষ্ণকে আবার উপাস্যরূপ পৃথক্‌ভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহারা আবার গোপীভাব প্রাপ্ত হইলেন। তখনই ‘তাঁহাদের সম্মুখে মুখকমলে মৃদুহাস্যযুত, পীতাম্বরধারী, মাল্যভূষিত ও সাক্ষাৎ মন্মথের মন-মথনকারী কৃষ্ণ আবির্ভূত হইলেন।’ ১৭

এখন আবার আমরা আমাদের আচার্য শঙ্করের কথায় আসিতেছি। শঙ্কর বলেনঃ যাঁহারা সগুণব্রহ্মের উপাসনা করিয়া পরমেশ্বরের সহিত মিলিত হন, অথচ যাঁহাদের মন লয় হয় না, অক্ষুণ্ণ থাকে, তাঁহাদের ঐশ্বর্য সসীম কি অসীম? এই সংশয় উপস্থিত হইলে যুক্তি দেখানো হয় যে, তাঁহাদের ঐশ্বর্য অসীম, কারণ শাস্ত্রে পাওয়া যায় ‘তিনি স্বারাজ্য লাভ করেন’, ‘সকল দেবতা তাঁহার পূজা করেন’, ‘সমগ্র জগতে তাঁহার কামনার পূর্তি হয়।’ ইহার উত্তরে ব্যাসের উক্তি ‘জগদ্ব্যাপারবর্জং; মুক্তাত্মাগণ জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় ব্যতীত অন্যান্য অণিমাদি শক্তি লাভ করেন। জগতের নিয়ন্তৃত্ব কেবল নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরের—

কারণ সৃষ্টিসম্বন্ধে যত শাস্ত্রীয় উক্তি আছে, সবগুলিতে তাঁহারই কথা বলা হইয়াছে। কোন প্রসঙ্গে সেখানে মুক্তাত্মাদের কোন উল্লেখ নাই। সেই পরম পুরুষ একাই জগন্নিয়ন্তৃত্বে নিযুক্ত। সৃষ্টাদি বিষয়ে যত শ্রুতি আছে, সবই তাঁহাকে লক্ষ্য করিতেছে। আর তাঁহার প্রসঙ্গে 'নিত্যসিদ্ধ' এই বিশেষণেও প্রদত্ত হইয়াছে। শাস্ত্র আরও বলেন, মুক্তাত্মাদের অণিমাদি-শক্তি ঈশ্বরের উপাসনা ও অন্বেষণ হইতেই লব্ধ হয়। অতএব সেই শক্তিগুলি অসীম নয়—সেগুলির আদি আছে ও সেগুলি সীমাবদ্ধ, সুতরাং জগতের নিয়ন্তৃত-বিষয়ে মুক্তাত্মাদের কোন স্থান নাই। আবার তাঁহাদের নিজ নিজ মনের অস্তিত্ববশতঃ এরূপ সম্ভব যে, পরস্পরের ইচ্ছা ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে; একজন হয়তো সৃষ্টি ইচ্ছা করিলেন, আর একজন নাশ ইচ্ছা করিলেন। এই বিরোধ এড়াইবার একমাত্র উপায়—সমুদয় ইচ্ছা এক ইচ্ছার অধীন করা। অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, মুক্ত পুরুষগণের ইচ্ছা সেই 'পরম পুরুষের অধীন।' ১৮

অতএব সগুণ ব্রহ্মেরই প্রতি ভক্তি প্রয়োগ সম্ভব। 'যাহারা অব্যক্ত নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসক তাহাদের ক্লেশ অধিকতর।'১৯ ভক্তি মানবপ্রকৃতির অনুকূলে সহজভাবে প্রবাহিত। আমরা ব্রহ্মের মানবীয় ভাব ব্যতীত অপর কোন ভাব ধারণ করিতে পারি না—ইহা সত্য কথা। কিন্তু আমাদের জ্ঞাত আর সকল বস্তুর সম্বন্ধেও কি ইহা সমভাবে সত্য নয়? পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনোবিজ্ঞানবিৎ ভগবান্ কপিল বহুযুগ পূর্বে প্রমাণসহ দেখাইয়াছেন যে, আমাদের বাহ্য বা আন্তর সর্বপ্রকার বিষয়জ্ঞান বা ধারণার মধ্যে মানবীয় চেতনা বা বুদ্ধি অন্যতম উপাদান। শরীর হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশ্বর পর্যন্ত বিচার করিলে দেখিতে পাইব, আমাদের অনুভূত সমুদয় বস্তুই বুদ্ধি ও তাহার সহিত অপর কোন বস্তুর মিশ্রণ, তা সেটি যাহাই হউক। আর যাহাকে আমরা সচরাচর 'সত্য বস্তু' বলিয়া মনে করি, তাহা এই অনিবার্য মিশ্রণ। বাস্তবিকই বর্তমানে বা ভবিষ্যতে মানবমনের পক্ষে সত্যের জ্ঞান যতদূর সম্ভব, তাহা ইহার অতিরিক্ত আর কিছু নয়। অতএব ঈশ্বর মানবধর্মী বলিয়া তাঁহাকে অসত্য বলা নিছক বাজে কথা। এ যেন পাশ্চাত্য দর্শনে বিজ্ঞানবাদ (Idealism) ও বাস্তববাদের (Realism) মধ্যে তুচ্ছ বিবাদের মত। ঐ বিবাদ আপাততঃ ভয়াবহ বোধ হইলেও বাস্তব (real)-শব্দের অর্থ লইয়া মারপ্যাঁচের উপর স্থাপিত। 'সত্য' শব্দের দ্বারা

যত প্রকার ভাব সূচিত হইয়াছে, সে-সব ভাবই 'ঈশ্বর' ভাবটির অন্তর্গত। জগতের অন্যান্য বস্তু যতদূর সত্য, ঈশ্বরও ততদূর সত্য। আর বাস্তব-শব্দটি এখানে যে অর্থে প্রযুক্ত হইল, ঐ শব্দদ্বারা তদপেক্ষা অধিক আর কিছু বুঝায় না। ইহাই হিন্দুদর্শনে ঈশ্বরসম্বন্ধীয় ধারণা।

১০ জন্মাদ্যস্য যতঃ। —ব্রহ্মসূত্র, ১।১।২

১১ পাতঞ্জল যোগসূত্র, ১।২৫।২৬

১২ স ঈশ্বরোঽনির্বচনীয়প্রেমস্বরূপ। —শাণ্ডিল্যসূত্র

১৩ জগদ্ব্যাপারবর্জং প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাচ্চ। —ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১৭

১৪ কিং মুক্তস্যৈশ্বর্যং জগৎসৃষ্ট্যাদি পরমপুরুষাসাধারণং সর্বেশ্বরত্বমপি উত তদ্রহিতং কেবলপরমপুরুষানুভববিষয়মিতি সংশয়ঃ, কিং যুক্তং, জগদীশ্বরত্বমপীতি, কুতঃ নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতীতি পরমপুরুষেণ পরমসাম্যাপত্তিশ্রুতেঃ সত্যসংকল্পত্বশ্রুতেশ্চ, নহি পরমসাম্যসত্যসঙ্কল্পত্বে সর্বেশ্বরাসাধারণজগদ্ব্যাপাররূপজগন্নিয়মনেন বিনোপপদ্যেতে অতঃ সত্যসঙ্কল্পতাপরমসাম্যোপপত্তয়ে সমস্তজগন্নিয়মনরূপমপিমুক্তৈশ্বর্যমিত্যেবং প্রাপ্তেঃ,প্রচক্ষ্মহে—জগদ্ব্যাপারবর্জমিতি জগদ্ব্যাপারো নিখিলচেতনাচেতন-স্বরূপস্থিতিপ্রবৃত্তিভেদনিয়মনন্তদ্বর্জং নিরস্তনিখিলতিরোধানস্য নির্ব্যাজব্রহ্মানুভবরূপং মুক্তস্যৈশ্বর্যং কুতঃ প্রকরণাৎ নিখিলজগন্নিয়মনং হি পরং ব্রহ্ম প্রকৃত্যাম্নায়তে, 'যতো বা ইমানি ভুতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি'।যদ্যেতন্নিখিলজগন্নিয়মনং মুক্তানামপি সাধারণং স্যাৎ ততশ্চেদং জগদীশ্বরত্বরূপং ব্রহ্মলক্ষণং ন সঙ্গচ্ছতে। অসাধারণস্য হি লক্ষণত্বং তথা 'সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি তত্তেজোঽসৃজতেতি' 'ব্রহ্ম বা ইদমেকমেবাগ্র আসীত্তদেকং সন্নব্যভবৎ, তচ্ছ্রেয়োরূপমত্যসৃজত ক্ষত্রং যান্যেতানি দেবক্ষত্রাণীন্দ্রো বরুণঃ সোমো রুদ্রঃ পর্জন্যো যমো মৃত্যুরীশান' ইতি 'আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চনমিষৎ স ঐক্ষত লোকান্নুসৃজা ইতি স ইমাল্লোকানসৃজত ইতি'। 'একো হ বৈ নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা নেশানো নেমে দ্যাবাপৃথিবী

ন নক্ষত্রাণি নাপো নাগ্নির্ণ সোমো ন সূর্যঃ স একাকী ন রমতে তস্য ধ্যানান্তস্থস্যৈকা কন্যা দশেন্দ্রিয়াণি' ইত্যাদিষু যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তর' ইত্যারভ্য 'য আত্মনি তিষ্ঠন্ ইত্যাদিষু চ নিখিলজগন্নিয়মনং পরমপুরুষং প্রকৃত্যৈব শ্রূয়তে' অসন্নিহিতত্বাচ্চ, ন চৈতেষু নিখিলজগন্নিয়মনপ্রসঙ্গেষু মুক্তস্য সন্নিধানমস্তি যেন জগদ্ব্যাপারস্তস্যাপি স্যাৎ। – রামানুজভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১৭

১৫ 'প্রত্যক্ষোপদেশান্নেতিচেন্নাধিকারিকমণ্ডলস্থোক্তেঃ।' এই সূত্রের (ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১৮) রামানুজভাষ্য দ্রষ্টব্য।

১৬ আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ। –শ্রীমদ্ভাগবত, ১।৭।১

১৭ তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ।। –শ্রীমদ্ভাগবত, ১০।৩২।২

১৮ যে সগুণব্রহ্মোপাসনাৎ সহৈব মনসেশ্বরসাযুজ্যং ব্রজন্তি কিন্তেষাং নিরবগ্রহমৈশ্বর্যং ভবত্যাহোস্বিৎ সাবগ্রহমিতি সংশয়ঃ। কিন্তাবৎ প্রাপ্তম্? নিরঙ্কুশমেবৈষামৈশ্বর্যং ভবিতুমর্হতি 'আপ্নোতি স্বারাজ্যম্' 'সর্বেঽস্মৈ দেবা বলিমাবহন্তি' 'তেষাং সর্বেষু লোকেষু কামচরো ভবতি' ইত্যাদিশ্রুতিভ্য ইত্যেবং প্রাপ্তে পঠতি–জগদ্ব্যাপারবর্জমিতি। জগদুৎপত্ত্যাদি ব্যাপারং বর্জয়িত্বাঽন্যদণিমাদ্যাত্মকমৈশ্বর্যং মুক্তানাং ভবিতুমর্হতি, জগদ্ব্যাপারস্তু নিত্যসিদ্ধস্যৈবেশ্বরস্য। কুতঃ? তস্য তত্র প্রকৃতত্বাদসন্নিহিতত্বাচ্চেতরেষাম্। পর এব হীশ্বরো জগদ্ব্যাপারেঽধিকৃতঃ তমেব প্রকৃত্যোৎপত্ত্যাদ্যুপদেশান্নিত্যশব্দনিবন্ধনত্বাচ্চ। তদন্বেষণবিজিজ্ঞাসনপূর্বকমিতরেষামাদিমদৈশ্বর্যং শ্রূয়তে। তেনাসন্নিহিতাস্তে জগদ্ব্যাপারে। সমনস্কত্বাদেব চৈষামনৈকমত্যে কস্যচিৎ স্থিত্যাভিপ্রায়ঃ, কস্যচিৎ সংহারাভিপ্রায় ইত্যেবং বিরোধোঽপি কদাচিৎ স্যাৎ। অথ কস্যচিৎ সঙ্কল্পমন্বন্যস্য সঙ্কল্প ইত্যবিরোধ সমর্থ্যেত, পরমেশ্বরাকূততন্ত্রত্বমেবেতরেষামিতি ব্যবতিষ্ঠন্তে। – শাঙ্করভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১৭

১৯ গীতা, ১২।৫

৩. প্রত্যাক্ষানুভূতিই ধর্ম

ভক্তের পক্ষে এই-সকল শুষ্ক বিষয় জানার প্রয়োজন—কেবল নিজ ইচ্ছাশক্তিকে দৃঢ় করার জন্য। এতদ্ব্যতীত উহাদের আর কোন উপযোগিতা নাই, কারণ তিনি এমন এক পথে চলিয়াছেন যাহা শীঘ্রই তাঁহাকে যুক্তির অস্পষ্ট ও চিত্তচঞ্চলকারী রাজ্যের সীমা ছাড়াইয়া প্রত্যক্ষানুভূতির রাজ্যে লইয়া যাইবে; তিনি শীঘ্রই ঈশ্বরকৃপায় এমন এক অবস্থায় উপনীত হন, যেখানে পাণ্ডিত্যাভিমানিগণের শুষ্ক যুক্তি অনেক পশ্চাতে পড়িয়া থাকে, আর বুদ্ধির সাহায্যে অন্ধকারে বৃথান্বেষণের পরিবর্তে প্রত্যক্ষানুভূতির উজ্জ্বল দিবালোক প্রকাশিত হয়। তিনি তখন বিচার বা বিশ্বাস কিছুই করেন না, তিনি প্রত্যক্ষ অনুভব করেন। তিনি আর তর্ক করেন না, উপলব্ধি করেন। আর এই ভগবানকে দেখা, তাঁহাকে উপলব্ধি করা ও তাঁহাকে সম্ভোগ করা কি তর্কবিচার হইতে উচ্চতর নয়? শুধু তাই নয়, অনেক ভক্ত আছেন, যাঁহারা ভক্তিকে মুক্তি হইতেও বড় বলিয়াও বর্ণনা করিয়াছেন। আর ইহা কি আমাদের জীবনের সর্বোচ্চ প্রয়োজনও নয়? এমন লোক জগতে আছেন, তাঁহাদের সংখ্যাও অনেক, যাঁহারা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যাহা কিছু মানুষকে সুখ দিতে পারে—তাহারই বাস্তবিক প্রয়োজন ও উপকারিতা আছে; ধর্ম, ঈশ্বর, পরকাল, আত্মা এবং এইরূপ অন্যান্য বিষয়গুলি কোন কাজের নয়, কারণ এগুলি দ্বারা টাকাকড়ি বা দৈহিক সুখ পাওয়া যায় না। এরূপ লোকের মতে যে-সকল পদার্থে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ না হয়, সেগুলির কোন প্রয়োজন নাই। যাহার যে-বিষয়ে যেমন অভাববোধ, তাহার প্রয়োজনবোধও সেই বিষয়ে তদনুরূপ। সুতরাং যাহারা পান, ভোজন, অপত্য-উৎপাদন ও তারপর মৃত্যু—ইহার উপর আর উঠিতে পারে না, তাহাদের পক্ষে লাভ-বোধ কেবল ইন্দ্রিয়ের সুখে। তাহাদের হৃদয়ে উচ্চতর বিষয়ের জন্য সামান্য ব্যাকুলতা জন্মিতেও অনেক জন্ম লাগিবে। কিন্তু যাঁহাদের নিকট আত্মার উন্নতি-সাধন ঐহিক জীবনের ক্ষণিক সুখ অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান্ বোধ হয়, যাঁহাদের চক্ষে ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি কেবল অবোধ শিশুর ক্রীড়ার মত মনে হয়, তাঁহাদের নিকট ভগবান্ ও ভগবৎ-প্রেমেই মানবজীবনের

সর্বোচ্চ ও একমাত্র প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হয়। ঈশ্বরেচ্ছায় এই ঘোর ভোগলিপ্সাপূর্ণ জগতে এইরূপ মানুষ এখনও কয়েকজন জীবিত আছেন।

পূর্বেই বলিয়াছি, ভক্তি পরা ও গৌণী—এই দুই ভাগে বিভক্ত; 'গৌণী' অর্থাৎ সাধন ভক্তি, 'পরাভক্তি' উহারই পূর্ণ বা চরম অবস্থা। ক্রমশঃ বুঝিতে পারিব, এই ভক্তিমার্গে অগ্রসর হইতে হইলে সাধনাবস্থায় কতকগুলি বাহ্য সহায় না লইলে চলে না। বাস্তবিক সকল ধর্মের পৌরাণিক ও রূপক ভাগই প্রথমাবস্থায় উন্নতিকামী আত্মাকে ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতে সাহায্য করে। আর ইহাও একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়—যাহাদের ধর্মপ্রণালী পৌরাণিকভাববহুল ও অনুষ্ঠানপ্রচুর, সেই-সকল সম্প্রদায়েই বড় বড় ধর্মবীর জন্মিয়াছিলেন। যাহা কিছু কবিত্বময়, যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু মহান্, যাহা কিছু ভগবৎ-পথে স্খলিতচরণে অগ্রসর সুকুমার মনের দৃঢ় অবলম্বন-স্বরূপ, সেই ভাবগুলিকে যে-সকল শুষ্ক গোঁড়ামিপূর্ণ ধর্মপ্রণালী একেবারে উৎপাটন করিয়া ফেলিতে চায়—যে-সকল ধর্মপ্রণালী আধ্যাত্মিক হর্ম্যের ছাদের অবলম্বন স্তম্ভগুলিকে পর্যন্ত ভাঙিয়া ফেলিতে চেষ্টা করে এবং সত্যসম্বন্ধে অজ্ঞান ও ভ্রমপূর্ণ ধারণা লইয়া যাহা কিছু জীবনপ্রদ, যাহা কিছু মানবহৃদয়ে ক্রমবর্ধমান আধ্যাত্মিক জীবনরূপ চারাগাছটির গঠনোপযোগী উপাদান, সেগুলি পর্যন্ত দূর করিয়া দিতে চায়, দেখিতে পাওয়া যায়—সেই-সকল ধর্ম শীঘ্রই একটি আধারে, শব্দরাশি ও তর্কাভাসের একটি কাঠামোতে পর্যবসিত হইয়াছে। হয়তো একটু সামাজিক আবর্জনা-দূরীকরণ বা তথাকথিত সংস্কার-প্রিয়তার আভাসযুক্ত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

যাহাদের ধর্ম এইরূপ, তাহাদের মধ্যে অনেকেই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে জড়বাদী; তাহাদের ঐহিক ও পারত্রিক জীবনের লক্ষ্য কেবল ভোগ; উহাই তাহাদের মতে মানবজীবনের সর্বস্ব। মানুষের ঐহিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অভিপ্রেত রাস্তা-ঘাট পরিষ্কার রাখা প্রভৃতি কার্যই২০ ইহাদের মতে মানব-জীবনের সর্বস্ব। এই অজ্ঞান ও গোঁড়ামির অদ্ভুত মিশ্রণের অনুগামিগণ যত শীঘ্র তাহাদের স্বরূপ প্রকটিত করিয়া বাহির হয় এবং নাস্তিক জড়বাদীদের দলে যোগ দেয়—ইহাই তাহাদের করা উচিত—ততই সংসারের মঙ্গল।

একবিন্দু ধর্মানুষ্ঠান ও অপরোক্ষানুভূতি রাশি রাশি বাক্‌প্রপঞ্চ ও মূর্খ-সুলভ ভাবোচ্ছ্বাস অপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ। অজ্ঞান ও গোঁড়ামির এই শুষ্ক ধূলিময় ক্ষেত্রে একজন—মাত্র একজন অমিততেজা ধর্মবীর জন্মিয়াছেন, দেখাও তো! না পার, চুপ করিয়া থাক, হৃদয়ের দরজা-জানালা খুলিয়া দাও, সত্যের বিমল আলোক প্রবেশ করুক, তত্ত্বদর্শী সেই ভারতীয় সাধুগণের পদতলে বালকের ন্যায় বসিয়া শোন, তাঁহারা কি বলিতেছেন।

২০ ইষ্টাপূর্ত

৪. গুরুর প্রয়োজনীয়তা

জীবাত্মামাত্রেই পূর্ণতা লাভ করিবেই—শেষ পর্যন্ত সকলেই সিদ্ধাবস্থা লাভ করিবে। আমরা এখন যাহা হইয়াছি, তাহা আমাদের অতীত কার্য ও চিন্তাশক্তির ফলস্বরূপ। আর ভবিষ্যতে যাহা হইবে, তাহা বর্তমানে যেরূপ চিন্তা ও কার্য করিতেছি তাহার ফলস্বরূপ হইবে। কিন্তু আমরা নিজেরাই নিজেদের অদৃষ্ট গঠন করিতেছি বলিয়া যে বাহির হইতে আমাদের কোন সহায়তার আবশ্যক নাই, তাহা নয়। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরূপ সহায়তা একান্ত ভাবে প্রয়োজন। যখন এই সহায়তা পাওয়া যায়, তখন আত্মার উচ্চতর শক্তি ও আপাত-অব্যক্ত ভাবগুলি ফুটিয়া উঠে, আধ্যাত্মিক জীবন সতেজ হইয়া উঠে, উহার উন্নতি ত্বরান্বিত হয়, সাধক অবশেষে শুদ্ধস্বভাব ও সিদ্ধ হইয়া যায়।

এই সঞ্জীবনী শক্তি গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায় না। একটি আত্মা কেবল অপর এক আত্মা হইতে এই শক্তি লাভ করিতে পারে, আর কিছু হইতেই নয়। আমরা সারাজীবন পুস্তক পাঠ করিতে পারি, খুব একজন বুদ্ধিমান্ হইয়া উঠিতে পারি, কিন্তু শেষে দেখিব—আধ্যাত্মিক উন্নতি কিছুই হয় নাই। বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি হইলেই যে সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক উন্নতিও খুব হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। গ্রন্থপাঠ করিতে করিতে অনেক সময় ভ্রমবশতঃ ভাবি, আমাদের আধ্যাত্মিক উপকার হইতেছে। কিন্তু গ্রন্থপাঠে আমাদের কি ফল হইয়াছে, তাহা যদি ধীরভাবে বিশ্লেষণ করি, তবে দেখিব বড়জোর আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি হইয়াছে, অন্তরাত্মার কিছুই হয় নাই। আমাদের মধ্যে প্রায় সকলেরই আধ্যাত্মিক বাক্যবিন্যাসে অদ্ভুত নৈপুণ্য থাকিলেও কার্যকালে—প্রকৃত ধর্মভাবে জীবন-যাপন করিবার সময়—কেন এত ভয়াবহ ত্রুটিবিচ্যুতি লক্ষিত হয়, তাহার কারণ—আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতির পক্ষে গ্রন্থরাশি পর্যাপ্ত নয়। জীবাত্মার শক্তি জাগ্রত করিতে হইলে অপর এক আত্মা হইতে শক্তি সঞ্চারিত হওয়া আবশ্যক।

যে ব্যক্তির আত্মা হইতে অপর আত্মায় শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাঁহাকে ‘গুরু’ বলে; এবং যে ব্যক্তির আত্মায় শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাঁহাকে ‘শিষ্য’ বলে। এইরূপ শক্তিসঞ্চার করিতে

হইলে প্রথমতঃ যিনি সঞ্চার করিবেন, তাঁহার এই সঞ্চার করিবার শক্তি থাকা আবশ্যক; আর যাঁহাতে সঞ্চারিত হইবে, তাঁহারও গ্রহণ করিবার শক্তি থাকা আবশ্যক। বীজ সতেজ হওয়া আবশ্যক, ভূমিও ভালভাবে কর্ষিত থাকা প্রয়োজন। যেখানে এই দুইটি বিদ্যমান সেখানেই প্রকৃত ধর্মের অপূর্ব বিকাশ দৃষ্ট হয়। 'ধর্মের প্রকৃত বক্তা অবশ্যই আশ্চর্য পুরুষ হইবেন, শ্রোতারও সুনিপুণ হওয়া চাই।'২১ যখন উভয়েই আশ্চর্য ও অসাধারণ হয়, তখনই আশ্চর্য আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটে, অন্যত্র নয়। ঐরূপ ব্যক্তিই প্রকৃত গুরু, এবং এইরূপ ব্যক্তিই প্রকৃত শিষ্য—মুমুক্ষু সাধক। আর সকলে ধর্ম লইয়া ছেলেখেলা করিতেছে মাত্র। তাহাদের কেবল একটু কৌতূহল, একটু জানিবার ইচ্ছামাত্র হইয়াছে, কিন্তু তাহারা এখনও ধর্মচক্রবালের বহির্দেশে রহিয়াছে। অবশ্য ইহারও কিছু মূল্য আছে, কারণ সময়ে ইহা হইতেই প্রকৃত ধর্ম-পিপাসা জাগিতে পারে। আর প্রকৃতির এই বিচিত্র নিয়ম যে, যখনই ক্ষেত্র উপযুক্ত হয়, তখনই বীজ নিশ্চয়ই আসিবে—আসিয়াও থাকে। যখনই আত্মার ধর্মলাভের আগ্রহ প্রবল হয়, তখনই ধর্মশক্তি-সঞ্চারক পুরুষ সেই আত্মার সহায়তার জন্য অবশ্যই আসিবেন, আসিয়াও থাকেন। যখন গ্রহীতার ধর্মালোক আকর্ষণ করিবার শক্তি পূর্ণ ও প্রবল হয়, তখন সেই আকর্ষণে আকৃষ্ট আলোকশক্তি অবশ্যই আসিয়া থাকে।

তবে পথে কতকগুলি মহাবিঘ্ন আছে, যথা—ক্ষণস্থায়ী ভাবোচ্ছ্বাসকে প্রকৃত ধর্ম-পিপাসা বলিয়া ভ্রম হইবার সম্ভাবনা। আমরা নিজেদের জীবনেই ইহা লক্ষ্য করিতে পারি। আমাদের জীবনে অনেক সময় এরূপ দেখা যায়ঃ হয়তো কাহাকেও খুব ভালবাসিতাম, তাহার মৃত্যু হইল, আঘাত পাইলাম। মনে হইল, যাহা ধরিতেছি তাহাই হাত ফসকাইয়া চলিয়া যাইতেছে, আমাদের প্রয়োজন একটি দৃঢ়তর উচ্চতর আশ্রয়—আমাদিগকে অবশ্যই ধার্মিক হইতে হইবে। কয়েকদিনেই ঐ ভাবতরঙ্গ কোথায় চলিয়া গেল! আমরা যেখানে ছিলাম সেখানেই পড়িয়া রহিলাম। আমরা সকলেই এইরূপ ভাবোচ্ছ্বাসকে প্রকৃত ধর্মপিপাসা বলিয়া অনেক সময়ই ভুল করিতেছি। কিন্তু যতদিন এই ক্ষণস্থায়ী ভাবোচ্ছ্বাসকে ভ্রমবশে প্রকৃত ধর্মপিপাসা মনে করিব, ততদিন ধর্মের জন্য যথার্থ স্থায়ী ব্যাকুলতা জন্মিবে না, আর ততদিন শক্তিসঞ্চারকারী পুরুষেরও সাক্ষাৎ পাইব না। এই

কারণে যখনই আমাদের মনে হয়, সত্যলাভের জন্য আমাদের এ-সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইতেছে, তখনই ঐরূপ মনে করা অপেক্ষা নিজেদের অন্তরের অন্তস্তলে অন্বেষণ করিয়া দেখা উচিত, হৃদয়ে প্রকৃত আগ্রহ জন্মিয়াছে কিনা। এরূপ করিলে অধিকাংশ স্থলেই দেখিব, আমরা সত্যগ্রহণের উপযুক্ত নই—আমাদের প্রকৃত ধর্মপিপাসা জাগে নাই।

আবার শক্তিসঞ্চারক গুরুসম্বন্ধে আরও অনেক বিঘ্ন আছে। অনেকে আছে যাহারা স্বয়ং অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়াও অহঙ্কারে নিজেদের সর্বজ্ঞ মনে করে, শুধু তাই নয়, অপরকেও নিজ স্কন্ধে লইয়া যাইবে বলিয়া ঘোষণা করে। এইরূপে অন্ধ অন্ধকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে যাইতে উভয়েই খানায় পড়িয়া যায়। 'অজ্ঞানে আচ্ছন্ন, অতি নির্বুদ্ধি হইলেও নিজেদের মহাপণ্ডিত মনে করিয়া মূঢ় ব্যক্তিগণ অন্ধের দ্বারা নীয়মান অন্ধের ন্যায় প্রতি পদবিক্ষেপেই স্খলিতপদ হইয়া পরিভ্রমণ করে।' ২২

এইরূপ মানুষেই জগৎ পরিপূর্ণ। সকলেই গুরু হইতে চায়। ভিখারীও লক্ষ টাকা দান করিতে চায়। এইরূপ লোক যেমন সকলের নিকট হাস্যাস্পদ হয়, এই গুরুগণও তেমনি।

২১ 'আশ্চর্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা' ইত্যাদি।—কঠ উপ., ১।২। ৭
২২ অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ... ...অন্ধেনৈব নীয়মানাঃ যথান্ধাঃ—মুণ্ডক উপ., ১।২।৮; কঠ উপ. , ১।২।৫

৫. গুরু ও শিষ্যের লক্ষণ

তবে গুরু চিনিব কিরূপে? সূর্যকে প্রকাশ করিতে মশালের প্রয়োজন হয় না। সূর্যকে দেখিবার জন্য আর বাতি জ্বালিতে হয় না। সূর্য উঠিলে আমরা স্বভাবতই জানিতে পারি যে সূর্য উঠিয়াছে; এইরূপ আমাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য লোকগুরুর আবির্ভাব হইলে আত্মা স্বভাবতই জানিতে পারে যে, তাঁহার উপর সত্যের সূর্যালোক-সম্পাত আরম্ভ হইয়াছে। সত্য স্বতঃপ্রমাণ, উহা প্রমাণ করিতে অপর কোন সাক্ষ্যের প্রয়োজন হয় নাই–উহা স্বপ্রকাশ; সত্য আমাদের অন্তস্তলে প্রবেশ করে, উহার সমক্ষে সমগ্র জগৎ দাঁড়াইয়া বলে–'ইহাই সত্য।' যে-সকল আচার্যের হৃদয়ে জ্ঞান ও সত্য সূর্যালোকের ন্যায় প্রতিভাত, তাঁহারা জগতের মধ্যে সর্বোচ্চ মহাপুরুষ, আর জগতের অধিকাংশ লোকই তাঁহাদিগকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করে। কিন্তু আমরা অপেক্ষাকৃত অল্পজ্ঞানীর নিকটও আধ্যাত্মিক সাহায্য লাভ করিতে পারি। তবে আমাদের এরূপ অন্তর্দৃষ্টি নাই যে, আমরা আমাদের গুরু বা আচার্যের সম্বন্ধে যথার্থ বিচার করিতে পারি; এই কারণে গুরুশিষ্য উভয়ের সম্বন্ধেই কতকগুলি পরীক্ষা আবশ্যক।

শিষ্যের এই গুণগুলি আবশ্যক–পবিত্রতা, প্রকৃত জ্ঞানপিপাসা ও অধ্যবসায়। অশুদ্ধাত্মা পুরুষ কখনও ধার্মিক হইতে পারে না। কায়মনোবাক্যে পবিত্র না হইলে কেহ কখনও ধার্মিক হইতে পারে না। আর জ্ঞানতৃষ্ণা সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, আমরা যাহা ছাই, তাহাই পাই–ইহা একটি সনাতন নিয়ম। যে বস্তু আমরা অন্তরের সহিত চাই, তাহা ছাড়া আমরা অন্য বস্তু লাভ করিতে পারি না। ধর্মের জন্য প্রকৃত ব্যাকুলতা বড় কঠিন জিনিষ; আমরা সচরাচর যত সহজ মনে করি, উহা তত সহজ নয়। শুধু ধর্মকথা শুনিলে আর ধর্মপুস্তক পড়িলেই যথেষ্টভাবে প্রমাণিত হয় না যে, হৃদয়ে ধর্মপিপাসা প্রবল হইয়াছে। যতদিন না প্রাণে ব্যাকুলতা জাগরিত হয় এবং যতদিন না আমরা প্রবৃত্তির উপর জয়লাভ করিতে পারি, ততদিন সদাসর্বদা অভ্যাস ও আমাদের পাশব প্রকৃতির সহিত নিরন্তর সংগ্রাম আবশ্যক। উহা দু-এক দিনের কর্ম নয়, কয়েক বৎসর বা দু-এক জন্মেরও কর্ম

নয়; শত শত জন্ম ধরিয়া এই সংগ্রাম চলিতে পারে। কাহারও পক্ষে অল্পকালের মধ্যেই সিদ্ধিলাভ ঘটিতে পারে, কিন্তু যদি অনন্তকাল অপেক্ষা করিতে হয়, ধৈর্যের সহিত তাহার জন্যও প্রস্তুত থাকা চাই। যে শিষ্য এইরূপ অধ্যবসায়-সহকারে সাধনে প্রবৃত্ত হয়, তাহার সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী।

গুরু সম্বন্ধে এইটুকু দেখিতে হইবে, তিনি যেন শাস্ত্রের মর্মজ্ঞ হন। জগতের সকলেই বেদ বাইবেল বা কোরান পাঠ করিতেছে, কিন্তু শাস্ত্রসমূহ শুধু শব্দ এবং ব্যাকরণ—ধর্মের কয়েকখানা শুষ্ক অস্থিমাত্র। যে গুরু শব্দ লইয়া বেশী নাড়াচাড়া করেন ও মনকে কেবল শব্দের ব্যাখ্যা দ্বারা চালিত হইতে দেন, তিনি ভাব হারাইয়া ফেলেন। শাস্ত্রের মর্ম যিনি জানেন, তিনিই যথার্থ ধর্মাচার্য। শাস্ত্রের শব্দজাল যেন মহারণ্য, মানুষ নিজেকে উহার ভিতর হারাইয়া ফেলে, পথ খুঁজিয়া পায় না। 'শব্দজাল মহারণ্যসদৃশ, চিত্তের ভ্রমণের কারণ।'২৩ 'শব্দযোজনা, সুন্দর ভাষায় বক্তৃতা ও শাস্ত্রমর্ম ব্যাখ্যা করিবার বিভিন্ন উপায়—পণ্ডিতদিগের বিচার ও আমোদের বিষয়মাত্র, উহা দ্বারা সিদ্ধি বা মুক্তিলাভের সহায়তা হয় না।'২৪ যাহারা ধর্মব্যাখ্যার সময় এইরূপ প্রণালী অবলম্বন করে, তাহারা কেবল নিজেদের পাণ্ডিত্য দেখাইতে ইচ্ছুক, তাহাদের ইচ্ছা—লোকে তাহাদিগকে মহাপণ্ডিত বলিয়া সম্মান করুক। জগতের প্রধান ধর্মাচার্যগণ কেহই এইভাবে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে অগ্রসর হন নাই। তাঁহারা শাস্ত্রের শ্লোকের অর্থ যথেচ্ছ ব্যাখ্যা করিতে কখনও চেষ্টা করেন নাই, শব্দার্থ ও ধাত্বর্থ লইয়া ক্রমাগত মারপ্যাঁচ করেন নাই। তাঁহারা শুধু জগৎকে শাস্ত্রের মহান্ ভাব শিক্ষা দিয়াছেন। আর যাহাদের শিখাইবার কিছুই নাই, তাহারা হয়তো শাস্ত্র হইতে একটি শব্দ লইয়া তাহারই উপর এক তিনখণ্ডে এক পুস্তক রচনা করে। সেই শব্দের আদি কি, কে ঐ শব্দটি প্রথম ব্যবহার করিয়াছিল, সে কি খাইত, কতক্ষণ ঘুমাইত, এইরূপ বিষয় লইয়াই কেহ হয়তো আলোচনা করিয়া গেলেন।

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ একটি গল্প বলিতেনঃ এক আম-বাগানে কয়েকজন লোক বেড়াইতে গিয়াছিল; বাগানে ঢুকিয়া তাহারা গনিতে আরম্ভ করিল, কটা আম গাছ, কোন্ গাছে কত আম, এক-একটা ডালে কত পাতা, আমের বর্ণ, আকার, প্রকার ইত্যাদি নানাবিধ

পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিচার করিতে লাগিল। আর একজন ছিল বিচক্ষণ, সে এসব গ্রাহ্য না করিয়া আম পাড়িতে লাগিল ও খাইতে লাগিল। বলো দেখি, কে বেশী বুদ্ধিমান্? আম খাও, পেট ভরিবে, কেবল পাতা গনিয়া—হিসাব করিয়া লাভ কি? এই পাতা-ডালপালা গোনা ও অপরকে উহার সংখ্যা জানাইবার চেষ্টা একেবারে ছাড়িয়া দাও। অবশ্য এরূপ কার্যের উপযোগিতা আছে, কিন্তু ধর্মরাজ্যে নয়। যাহারা এরূপ পাতা গনিয়া বেড়ায়, তাহাদের ভিতর হইতে কখনও একটিও ধর্মবীর বাহির করিতে পারিবে না। ধর্ম—যাহা মানবজীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য, মানুষের শ্রেষ্ঠ গৌরবের জিনিষ, তাহাতে পাতা-গোনারূপ অত পরিশ্রমের প্রয়োজন নাই। যদি তুমি ভক্ত হইতে চাও, তাহা হইলে কৃষ্ণ মথুরায় কি ব্রজে জন্মিয়াছিলেন, তিনি কি করিয়াছিলেন বা ঠিক কোন্ দিনে গীতা বলিয়াছিলেন, তাহা জানিবার কিছু আবশ্যক নাই। গীতায় কর্তব্য ও প্রেম সম্বন্ধে যে সুন্দর শিক্ষা আছে, আগ্রহের সহিত তাহা অনুসরণ করাই তোমার কাজ। উহার সম্বন্ধে বা উহার প্রণেতার সম্বন্ধে অন্যান্য বিশেষ বিবরণ জানা কেবল পণ্ডিতদের আমোদের জন্য। তাহারা যাহা চায় তাহা লইয়াই থাকুক। তাহাদের পণ্ডিতী তর্কবিচারে 'শান্তিঃ শান্তিঃ' বলিয়া এস আমরা আম খাইতে থাকি।

দ্বিতীয়তঃ গুরুর নিষ্পাপ হওয়া আবশ্যক। অনেক সময়ে লোকে বলিয়া থাকে, 'গুরুর চরিত্র, গুরু কি করেন না করেন, দেখিবার প্রয়োজন কি? তিনি যা বলেন তাহাই বিচার করিতে হইবে। সেইটি লইয়াই কাজ করা প্রয়োজন।' এ কথা ঠিক নয়। গতি-বিজ্ঞান, রসায়ন বা অন্য কোন জড়-বিজ্ঞানের শিক্ষক যাহাই হউন না কেন, কিছু আসে যায় না। কারণ উহাতে কেবল বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োজন হয়। কিন্তু অধ্যাত্মবিজ্ঞানের আচার্য অশুদ্ধচিত্ত হইলে তাঁহাতে আদৌ ধর্মালোক থাকিতে পারে না। অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি কী ধর্ম শিখাইবে? নিজে আধ্যাত্মিক সত্য উপলব্ধি করিবার বা অপরে শক্তি সঞ্চার করিবার একমাত্র উপায়—হৃদয় ও মনের পবিত্রতা। যতদিন না চিত্তশুদ্ধি হয়, ততদিন ভগবদ্দর্শন বা সেই অতীন্দ্রিয় সত্তার আভাসজ্ঞানও অসম্ভব। সুতরাং ধর্মাচার্যের সম্বন্ধে প্রথমেই দেখা আবশ্যক তিনি কি চরিত্রের লোক; তারপর তিনি কি বলেন তাহাও দেখিতে হইবে। তাঁহার সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধচিত্ত হওয়া আবশ্যক, তবেই তাঁহার কথার প্রকৃত একটা গুরুত্ব থাকে;

কারণ তাহা হইলেই তিনি প্রকৃত শক্তি-সঞ্চারকের যোগ্য হইতে পারেন। নিজের মধ্যেই যদি সেই শক্তি না থাকে, তবে তিনি সঞ্চার করিবেন কী? গুরুর মন এরূপ প্রবল আধ্যাত্মিকস্পন্দন-বিশিষ্ট হওয়া চাই যে, তাহা যেন সমবেদনাবশে শিষ্যে সঞ্চারিত হইয়া যায়। গুরুর বাস্তবিক কার্যই এই—কিছু সঞ্চার করা, কেবল শিষ্যের বুদ্ধিশক্তি বা অন্য কোন শক্তি উত্তেজিত করিয়া দেওয়া নয়। বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, গুরু হইতে শিষ্যে যথার্থই একটি শক্তি আসিতেছে। সুতরাং গুরুর শুদ্ধচিত্ত হওয়া আবশ্যক।

তৃতীয়তঃ দেখা আবশ্যক, গুরুর উদ্দেশ্য কি? গুরু যেন অর্থ, নাম-যশ বা কোন স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধর্মশিক্ষাদানে প্রবৃত্ত না হন—সমগ্র মানবজাতির প্রতি শুদ্ধ প্রেমই যেন তাঁহার কার্যের নিয়ামক হয়। আধ্যাত্মিক শক্তি শুদ্ধ প্রেমের মাধ্যমেই সঞ্চারিত করা যাইতে পারে। কোনরূপ স্বার্থপূর্ণ ভাব, লাভ বা যশের ইচ্ছা এক মুহূর্তে এই সঞ্চারের মাধ্যম নষ্ট করিয়া ফেলে। ভগবান্ প্রেমস্বরূপ, আর যিনি ভগবানকে প্রেমস্বরূপ বলিয়া জানিয়াছেন, তিনিই মানুষকে ভগবদ্ভাব শিক্ষা দিতে পারেন।

যদি দেখ—গুরুতে এইসব লক্ষণ বর্তমান, তবে জানিবে তোমার কোন আশঙ্কা নাই। নতুবা তাঁহার নিকট শিক্ষায় বিপদ আছে; যেহেতু তিনি যদি হৃদয়ে সদ্ভাব সঞ্চার করিতে না পারেন, তিনি হয়তো অসদ্ভাব সঞ্চার করিবেন। এই বিপদ হইতে নিজেকে সর্বতোভাবে সাবধান রাখিতে হইবে। 'যিনি বিদ্বান্ নিষ্পাপ ও কামগন্ধহীন, যিনি শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিৎ',২৫ তিনিই প্রকৃত সদ্গুরু।

যাহা বলা হইল, তাহা হইতে ইহা সহজেই প্রতীত হইবে যে, ধর্মে অনুরাগী হইবার, ধর্মের মর্মবোধ করিবার এবং উহা জীবনে পরিণত করিবার উপযোগী শিক্ষা যে-কোন ব্যক্তির নিকট হইতে পাওয়া যায় না। 'শিলাখণ্ডের নিকট ধর্মোপদেশ-শ্রবণ, নদীর কলনাদে গ্রন্থপাঠ ও সর্বত্র শুভদর্শন'২৬ আলঙ্কারিক বর্ণনাহিসাবে সত্য বটে, কিন্তু যাহার নিজের মধ্যে সত্য বিকশিত হয় নাই, সে কখনও এগুলি হইতে এতটুকু জ্ঞান আহরণ করিতে পারে না। পর্বত, নদী প্রভৃতি কাহাকে শিক্ষা দিতে পারে?—যাহার পবিত্র হৃদয়ে ভক্তিকমল ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেই মানবাত্মাকে। আর যে আলোকে এই কমল সুন্দররূপে ফুটিয়া

উঠে, তাহা ব্রহ্মবিৎ সদ্‌গুরুরই জ্ঞানালোক। যখন এইভাবে হৃদয় উন্মুক্ত হয়, তখন সেই হৃদয়—পর্বত, নদী, তারা, সূর্য, চন্দ্র অথবা এই বিশ্বে যাহা কিছু আছে, তাহা হইতেই শিক্ষা লাভ করিতে পারে। কিন্তু যাহার হৃদয় এখনও উন্মুক্ত হয় নাই, সে এ-সকলে পর্বতাদি ব্যতীত আর কিছু দেখিতে পাইবে না। চিত্রশালায় গিয়া অন্ধের কিছু লাভ নাই। আগে তাহাকে চক্ষু দাও, তবেই সে সেখানকার দর্শনীয় বস্তুসমূহ হইতে কি শিক্ষা পাওয়া যায়, বুঝিতে পারিবে।

গুরুই ধর্মশিক্ষার্থীর চক্ষু খুলিয়া দেন। সুতরাং কোন ব্যক্তির সহিত তাহার বংশধরের যে সম্বন্ধ, গুরুর সহিত শিষ্যেরও ঠিক সেই সম্বন্ধ। গুরুর প্রতি বিশ্বাস, বিনয়নম্র আচরণ, তাঁহার নিকট শরণগ্রহণ ও তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ব্যতিরেকে আমাদের হৃদয়ে ধর্মের বিকাশ হইতেই পারে না। আর ইহাও বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, যে-সব দেশে গুরুশিষ্যের এরূপ সম্বন্ধ আছে, কেবল সেই-সব দেশেই অসাধারণ ধর্মবীরগণ সকল জন্মিয়াছেন; আর যে-সব দেশে গুরুশিষ্যের এ সম্বন্ধ রক্ষা করা হয় নাই, সে-সব দেশে ধর্মের শিক্ষক কেবল বক্তামাত্র। নিজের প্রাপ্যের দিকেই তাঁহার দৃষ্টি, আর শিষ্য কেবল গুরুর কথাগুলিতেই মাথা পরিপূর্ণ করেন এবং অবশেষে উভয়েই নিজ নিজ পথ দেখেন,—একে আর অপরের চিন্তা করেন না, এরূপ ক্ষেত্রে ধর্ম প্রায়ই অজ্ঞাতই থাকিয়া যায়; আধ্যাত্মিক শক্তিসঞ্চার করিবার কেহ নাই, গ্রহণ করিবারও কেহ নাই। এই-সব লোকের কাছে ধর্ম যেন ব্যবসায়ে পরিণত। তাহারা মনে করে, অর্থ দ্বারা ধর্ম ক্রয় করা যায়। ঈশ্বরেচ্ছায় ধর্ম যদি এত সুলভ হইত! তাহাদের দুর্ভাগ্য এই যে, এরূপ হইবার নয়।

ধর্ম—সর্বোচ্চ জ্ঞানস্বরূপ যে ধর্ম, তাহা ধন-বিনিময়ে কিনিবার জিনিষ নয়, গ্রন্থ হইতেও তাহা পাওয়া যায় না। জগতের সর্বত্র ঘুরিয়া আসিতে পার, হিমালয় আল্পস্ ককেসস্ প্রভৃতি অন্বেষণ করিতে পার, সমুদ্রের তলদেশে আলোড়ন করিতে পার, তিব্বতের চারিকোণ অথবা গোবি-মরুর চতুর্দিকে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে পার, কিন্তু যতদিন না তোমার হৃদয় ধর্ম গ্রহণ করিবার উপযুক্ত হইতেছে এবং যতদিন না তুমি গুরুলাভ করিতেছ, কোথাও ধর্ম খুঁজিয়া পাইবে না। বিধাতৃনির্দিষ্ট এই গুরু যখনই লাভ করিবে,

অমনি বালকবৎ বিশ্বাস ও সরলতা লইয়া তাঁহার সেবা কর, তাঁহার নিকট প্রাণ খুলিয়া দাও, তাঁহাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর-রূপে দেখ। যাহারা এইরূপ প্রেম ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া সত্যানুসন্ধান করে, তাহাদের নিকট সত্যের ভগবান্ সত্য শিব ও সুন্দরের অতি আশ্চর্য তত্ত্বসমূহ প্রকাশ করেন।

২৩ শব্দজালং মহারণ্যং চিত্তভ্রমণকারণম্।–বিবেকচূড়ামণি, ৬০
২৪ বাগ্বৈখরী শব্দঝরী শাস্ত্রব্যাখ্যানকৌশলম্। বৈদুষ্যং বিদুষাং তদ্বদ্ভুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে॥– ঐ, ৫৮
২৫ শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতো যো ব্রহ্মবিত্তমঃ। –বিবেকচূড়ামণি, ৩৩
২৬ And this our life exempt from public haunt, Finds tongues in trees, books in the running brooks, Sermons in stones and good in every thing. — Shakespeare's 'As you Like It,' Act II, Sc. I

৬. অবতার

যেখানে লোকে তাঁহার (ঈশ্বরের) নামকীর্তন করে, সেই স্থান পবিত্র; আর যে-ব্যক্তি তাঁহার নাম করেন, তিনি আরও কত পবিত্র! আর যাঁহার নিকট আধ্যাত্মিক আলোক প্রাপ্ত হই, তাঁহার নিকট কতই না ভক্তির সহিত অগ্রসর হওয়া উচিত! ঐরূপ শ্রেষ্ঠ ধর্মাচার্যের সংখ্যা খুব বিরল বটে, কিন্তু জগৎ একেবারে এই-সকল আচার্য-বিরহিত হয় না। যে মুহূর্তে পৃথিবী একেবারে আচার্যশূন্য হয়, সেই মুহূর্তেই উহা এক ভয়ানক নরককুণ্ডে পরিণত হয় ও বিনাশের দিকে ধাবিত হয়। আচার্যগণই মানবজাতির সুন্দরতম প্রকাশস্বরূপ এবং 'অহেতুকদয়াসিন্ধু' ।২৭

শ্রীকৃষ্ণ ভাগবতে বলিয়াছেন, 'আমাকে আচার্য বলিয়া জানিও।'২৮ অর্থাৎ সাধারণ গুরুশ্রেণী অপেক্ষা উন্নততর আর এক শ্রেণীর গুরু আছেন—ঈশ্বরের অবতারগণ। ইহারা স্পর্শ দ্বারা, এমন কি—কেবল মাত্র ইচ্ছা দ্বারাই অপরের ভিতর ভগবদ্ভাব সঞ্চার করিয়া দিতে পারেন। তাঁহাদের ইচ্ছায় অতি দুশ্চরিত্র ব্যক্তিও মুহূর্তের মধ্যে সাধু হইয়া যায়। ইঁহারা গুরুরও গুরু, মানুষের ভিতর ভগবানের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি; আমরা তাঁহাদের ভিতর দিয়া ব্যতীত অন্য উপায়ে ভগবানকে দেখিতে পারি না। মানুষ তাঁহাদিগকে উপাসনা না করিয়া থাকিতে পারে না; আর বাস্তবিক এই আচার্যগণকে উপাসনা করিতে আমরা বাধ্য।

এই- সকল নররূপধারী ঈশ্বর ব্যতীত ভগবান্‌কে দেখিবার আমাদের আর অন্য কোন উপায় নাই। আমরা যদি আর কোন রূপে তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করি, তবে আমরা একটা কিম্ভূতকিমাকার বস্তু গঠন করি এবং উহাকেই প্রকৃত ঈশ্বর বলিয়া মনে করি। গল্প আছে—এক আনাড়ীকে শিব গড়িতে বলা হয়; অনেক দিন চেষ্টা করিয়া সে একটি বানর গড়িয়াছিল। সেইরূপ ভগবানকে নির্গুণ পূর্ণস্বরূপে যখনই আমরা ভাবিতে যাই, তখনই আমরা শোচনীয়ভাবে বিফল হই; কারণ যতদিন আমরা মানুষ, ততদিন তাঁহাকে মানুষভাবে ছাড়া অন্যভাবে কখনই ভাবিতে পারিব না। অবশ্য এমন সময় আসিবে, যখন আমরা মনুষ্যপ্রকৃতি অতিক্রম করিয়া তাঁহার স্বরূপবোধে সমর্থ হইব, কিন্তু যতদিন

সীমাবদ্ধ মানুষ থাকিব, ততদিন মানুষের ভিতর ও মানুষরূপেই তাঁহাকে উপাসনা করিতে হইবে। যাই বল না কেন, যতই চেষ্টা কর না কেন, ভগবানকে মানব-ভাবে ছাড়া আর কোন ভাবেই চিন্তা করিতে পার না। ঈশ্বর সম্বন্ধে বা জগতের অন্যান্য বস্তু সম্বন্ধে খুব যুক্তিতর্ক-সমন্বিত বক্তৃতা দিতে পার, খুব যুক্তিবাদী হইতে পার, আর ভগবানের এই-সকল মনুষ্য-অবতারের কথা সব ভ্রমাত্মক—এ-কথা নিজের সন্তোষজনকভাবে প্রমাণ করিতে পার, কিন্তু 'সহজ' বুদ্ধিতে কি বলে তাহা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক। এই প্রকার অসাধারণ বুদ্ধিবৃত্তির পশ্চাতে কি আছে? কিছুই নাই—শূন্য, কেবল কতকগুলি বাক্যাড়ম্বর মাত্র। তারপর যখন দেখিবে, কোন লোক এইরূপ অবতারপূজার বিরুদ্ধে মহাযুক্তিতর্কের সহিত বক্তৃতা করিতেছে, তাহাকে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করঃ ঈশ্বর সম্বন্ধে তোমার নিজের ধারণা কি? 'সর্বশক্তিমত্তা', 'সর্বব্যাপিতা' ও এইরূপ শব্দগুলি দ্বারা কি বোঝ? দেখিবে, ঐগুলির বানান ব্যতীত সে আর অধিক কিছু বোঝে না। এ-সকল শব্দের দ্বারা তাহার মনে কোন অর্থেরই বোধ হয় না, এমন কোন ভাব দ্বারা সে ঐগুলি ব্যক্ত করিতে পারে না, যাহা তাহার মানবীয় প্রকৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয় নাই। এই বিষয়ে রাস্তার যে লোকটা একখানা পুঁথিও পড়ে নাই, তাহার সহিত এ ব্যক্তির কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। তবে সে লোকটা শান্তপ্রকৃতি, জগতের শান্তিভঙ্গ করে না, আর এই বক্তা সমাজে অশান্তি ও দুঃখ সৃষ্টি করে। বাস্তবিক প্রত্যক্ষানুভূতিতেই ধর্ম, সুতরাং শূন্যগর্ভ বক্তৃতা ও প্রত্যক্ষানুভূতির মধ্যে আমাদের বিশেষ প্রভেদ করা আবশ্যক। আত্মার গভীরতম প্রদেশে আমরা যাহা অনুভব করি, তাহাকেই প্রত্যক্ষানুভূতি বলে। এই বিষয়ে 'সহজ' জ্ঞান যত দুর্লভ, আর কিছুই তত দুর্লভ নয়।

আমাদের বর্তমান প্রকৃতি যেরূপ, তাহাতে আমরা সীমাবদ্ধ; ভগবানকে আমরা মনুষ্য-রূপে দেখিতে বাধ্য। মনে কর, মহিষদের ভগবানকে পূজা করিবার ইচ্ছা হইল—তাহাদের স্বভাব অনুযায়ী তাহারা ভগবানকে একটি বৃহৎ মহিষরূপে দেখিবে। মৎস্য যদি ভগবানের আরাধনা করিতে ইচ্ছা করে, তবে তাহাকে ভাবিতে হইবে, ভগবান্ একটি বৃহৎ মৎস্য। মানুষকেও ভাবিতে হইবে, ভগবান্ মানুষ; আর ঐ-সকল সীমাবদ্ধ বিভিন্ন ধারণা বিকৃত-কল্পনাসম্ভূত নয়। মানুষ, মহিষ, মৎস্য—এগুলি যেন ভিন্ন ভিন্ন পাত্রস্বরূপ, সবগুলি

ভগবৎ-সমুদ্রে নিজ নিজ ধারণ-শক্তি ও আকৃতি অনুসারে পূর্ণ হইয়াছে। মানুষে ঐ জল মানুষের আকার ধারণ করিল, মহিষে মহিষের আকার ও মৎস্যে মৎস্যাকার ধারণ করিল। প্রত্যেক পাত্রে সেই এক ঈশ্বর-সমুদ্রের জল রহিয়াছে। নিজ মনের প্রকৃতি ও শক্তি অনুযায়ী যদি কেহ ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন ধারণা করে, আমরা তাহাকে দোষ দিতে পারি না। সুতরাং ঈশ্বরকে মানুষরূপেই উপাসনা করা ছাড়া আমাদের আর অন্য কোন পথ নাই।

প্রকার লোক ভগবানকে মানুষরূপে উপাসনা করে না। প্রথম—নরপশুগণ, যাহাদের কোনরূপ ধর্মজ্ঞান নাই; দ্বিতীয়—পরমহংসগণ, যাঁহারা মনুষ্যসুলভ সমুদয় দুর্বলতা অতিক্রম করিয়া মানবপ্রকৃতির সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছেন। সমুদয় প্রকৃতিই তাঁহাদের আত্মস্বরূপ হইয়া গিয়াছে। তাঁহারাই কেবল ভগবানকে তাঁহার স্বরূপে উপাসনা করিতে পারেন। অন্য সব বিষয়ে যেমন, এখানেও তেমনি—দুইটি চরম বিপরীত ভাব একরূপ দেখায়। অতিশয় অ-জ্ঞানী ও পরম জ্ঞানী—এ-দুয়ের কেহই উপাসনা করে না; নরপশুগণ অজ্ঞান বলিয়া উপাসনা করে না, জীবন্মুক্ত পুরুষগণ সর্বদা আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে অনুভব করিতেছেন বলিয়া তাঁহাদের আর স্বতন্ত্র উপাসনার প্রয়োজন হয় না। যে-ব্যক্তি এই দুই চূড়ান্তভাবের মধ্যবর্তী, অথচ বলে—আমি ভগবানকে মনুষ্যরূপে উপাসনা করিতে ইচ্ছা করি না, বিশেষ যত্নের সহিত সেই ব্যক্তির দেখাশুনা করা আবশ্যক। কঠোরতর ভাষা প্রয়োগ না করিয়াও বলিতে হয়, সে প্রলাপ বকিতেছে, সে ভুল করিয়াছে; তাহার ধর্ম বিকৃতমস্তিষ্ক ও বুদ্ধিহীন ব্যক্তিগণেরই উপযুক্ত।

ভগবান্ মানুষের দুর্বলতা বুঝেন, এবং মানুষের হিতের জন্যই মানুষরূপে অবতীর্ণ হন।২৯ ‘ যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি নিজেকে সৃজন করি। সাধুদের রক্ষা, পাপিগণের দুষ্কৃতিনাশ ও ধর্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করি।’৩০ ‘জগতের ঈশ্বর আমি,—আমার প্রকৃত স্বরূপ না জানিয়া অজ্ঞ ব্যক্তিরা মনুষ্যরূপধারী আমাকে উপহাস করে।’ ৩১

অবতার সম্বন্ধে গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই কথা ঘোষণা করিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, ‘যখন প্রবল বন্যা আসে, তখন সব ছোট ছোট নদী ও খানা

কানায় কানায় ভরিয়া যায়; সেইরূপ যখন অবতার আসেন, তখন আধ্যাত্মিক তরঙ্গ জগৎকে ভাসাইয়া লইয়া যায়, সাধারণ মানুষও তখন হাওয়াতেই ধর্মভাব অনুভব করে।’

২৭ বিবেকচূড়ামণি, ৩৫
২৮ আচার্য মাং বিজানীয়াৎ....। শ্রীমদ্ভাগবত, ১১। ১৭। ২০
২৯ স্যাৎ পরমেশ্বরস্য অপি ইচ্ছাবশান্মায়াময়ং রূপং সাধকানুগ্রহার্থম্।
–শাঙ্করভাষ্য, বেদান্তসূত্র, ১। ১। ২০
৩০ যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।
পরিত্রাণায়া সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।। –গীতা, ৪। ৭-৮
৩১ অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্। পরং ভাবমজানন্তো মম ভূত মহেশ্বরম্।।
–গীতা, ৯। ১১

৭. মন্ত্র

আমরা কিন্তু এখানে মহাপুরুষ বা অবতারগণের কথা বলিতেছি না; এখন আমরা সিদ্ধ গুরুদিগের বিষয় আলোচনা করিব। তাঁহাদিগকে সচরাচর মন্ত্র দ্বারা শিষ্যগণের ভিতর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বীজ বপন করিতে হয়। এই মন্ত্রগুলি কি? ভারতীয় দর্শনের মতে সমুদয় জগৎ নামরূপাত্মক। এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডরূপ মনুষ্যচিত্তে এমন একটি তরঙ্গ থাকিতে পারে না, যাহা নামরূপাত্মক নয়। যদি ইহা সত্য হয় যে, প্রকৃতি সর্বত্র এক নিয়মে গঠিত, তাহা হইলে এই নামরূপাত্মকতা বিরাট ব্রহ্মাণ্ডেরও নিয়ম বলিতে হইবে। 'যেমন একটি মৃৎপিণ্ডকে জানিলে আর সমস্ত মৃত্তিকাকেই জানিতে পারা যায়,'৩২তেমনি এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বা দেহপিণ্ডকে জানিতে পারিলে বিরাট ব্রহ্মাণ্ডকেও জানিতে পারা যায়। রূপ বস্তুর বাহিরের আবরণ বা খোসা, আর নাম বা ভাব যেন উহার অন্তর্নিহিত শস্য। ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড শরীরই রূপ, আর মন বা অন্তঃকরণই নাম, এবং বাক্‌শক্তিযুক্ত প্রাণিসমূহে এই নামের সহিত উহাদের বাচকশব্দগুলি নিত্যযুক্তভাবে বর্তমান। অন্যভাষায় বলিতে গেলে ব্যক্তি-মানুষের ভিতরেই 'ব্যষ্টিমহৎ' বা চিত্তে এই চিন্তাতরঙ্গগুলি উত্থিত হইয়া প্রথমে সূক্ষ্ম শব্দ বা ভাবরূপ—পরে তদপেক্ষা স্থূলতর আকার ধারণ করে।

বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডেও ব্রহ্মা, হিরণ্যগর্ভ বা 'সমষ্টিমহৎ' প্রথমে নিজেকে নামে, পরে রূপাকারে অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান জগদ্রূপে অভিব্যক্ত করেন। এই ব্যক্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎই 'রূপ'; ইহার পশ্চাতে অনন্ত অব্যক্ত 'স্ফোট' রহিয়াছে। 'স্ফোট' বলিতে সমুদয় জগতের অভিব্যক্তির কারণ 'শব্দব্রহ্ম'। সমুদয় নাম বা ভাবের উপাদান-স্বরূপ নিত্য স্ফোটেই সেই শক্তি, যাহা দ্বারা ভগবান্ এই জগৎ সৃষ্টি করেন; শুধু তাই নয়, ভগবান্ প্রথমে নিজেকে স্ফোটরূপে পরিণত করিয়া পরে অপেক্ষাকৃত স্থূল এই পরিদৃশ্যমান জগদ্রূপে বিকশিত করেন। এই স্ফোটের একটিমাত্র বাচক শব্দ আছে—'ওঁ'। আর কোনরূপ বিশ্লেষণ-বলেই যখন আমরা ভাব হইতে শব্দকে পৃথক্ করিতে পারি না, তখন এই ওঙ্কার ও নিত্য-স্ফোট অবিভাজ্যরূপে বর্তমান। এজন্য শ্রুতি বলেন, সমুদয় নামরূপের উৎস—ওঙ্কার-রূপ এই

পবিত্রতম শব্দ হইতে এই স্থূল জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। তবে যদি বলো—শব্দ ও ভাব নিত্যসম্বন্ধ বটে, কিন্তু একটি ভাবের বাচক বিবিধ শব্দ থাকিতে পারে, সুতরাং সমুদয় জগতের অভিব্যক্তির কারণস্বরূপ ভাবের বাচক যে এই একটি বিশেষ শব্দ ওঙ্কার, তাহা মনে করিবার কোন প্রয়োজন নাই। এই আপত্তির উত্তরে আমরা বলি, ওঙ্কারই এইরূপ সর্বভাব-প্রকাশক বাচক শব্দ, আর কোন শব্দ ইহার তুল্য নয়। স্ফোটই সমুদয় ভাবের উপাদান, ইহা কোন একটি বিশেষ ভাব নয়; অর্থাৎ বিভিন্ন ভাবগুলির মধ্যে পরস্পর যে বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা যদি দূর করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে এই স্ফোটই অবশিষ্ট থাকিবে। প্রত্যেকটি বাচক শব্দ এক-একটি ভাব প্রকাশ করে, অতএব উহা স্ফোটের প্রতীক হইতে পারে না। কারণ স্ফোট সর্বভাবের সমষ্টি। আর কোন বাচক শব্দ দ্বারা অব্যক্ত স্ফোটকে প্রকাশ করিতে হইলে উহা তাহাকে এতদূর বিশিষ্ট করিয়া ফেলে যে, তাহাতে আর সমষ্টি-ভাব থাকে না, উহা একটি বিশেষ ভাবে পরিণত হয়। অতএব স্ফোটকে বুঝাইতে হইলে এমন একটি শব্দ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, যাহা দ্বারা স্ফোট খুব অল্প পরিমাণে বিশেষভাবাপন্ন হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে উহার বিশ্বব্যাপী প্রকৃতি প্রায় যথাযথভাবে প্রকাশ করে, তাহাই উহার সর্বাপেক্ষা শুদ্ধ প্রতীক বা বাচক।

শ্রুতি বলেন, ওঙ্কার—কেবলমাত্র ওঙ্কারই এইরূপ শব্দপ্রতীক। কারণ অ, উ, ম—এই তিনটি অক্ষর একত্রে ‘অউম’ এইরূপে উচ্চারিত হইলে উহাই সর্বপ্রকার শব্দের সাধারণ বাচক হইতে পারে। সমুদয় শব্দের মধ্যে ‘অ’ সর্বাপেক্ষা কম বিশেষভাবাপন্ন। এই কারণেই শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন, ‘অক্ষরের মধ্যে আমি অকার।’৩৩ আর সমুদয় স্পষ্টোচ্চারিত শব্দই মুখগহ্বরের মধ্যে জিহ্বামূল হইতে আরম্ভ করিয়া ওষ্ঠ পর্যন্ত স্পর্শ করিয়া উচ্চারিত হয়। ‘অ’ কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত, ‘ম’ শেষ ওষ্ঠ্য বর্ণ। আর ‘উ’ জিহ্বামূল হইতে যে শক্তি আরম্ভ হইয়া ওষ্ঠে শেষ হয়, সেই শক্তিটি যেন গড়াইয়া যাইতেছে—এই ভাব প্রকাশ করে। প্রকৃতরূপে উচ্চারিত হইলে এই ওঙ্কার সমুদয় শব্দোচ্চারণ ব্যাপারটির সূচক; অন্য কোন শব্দেরই সেই শক্তি নাই; সুতরাং এই শব্দটিই স্ফোটের যোগ্যতম বাচক, আর এই স্ফোটেই ওঙ্কারের প্রকৃত বাচ্য। এবং বাচ্য হইতে বাচক পৃথক্ করা যাইতে পারে না, সুতরাং এই ‘ওঁ’ এবং ‘স্ফোট’ এক ও অভিন্ন। এই জন্য স্ফোটকে বলা

হয় ‘নাদব্রহ্ম’, আর যেহেতু এই স্ফোট ব্যক্ত জগতের সূক্ষ্মতর দিক্ বলিয়া ঈশ্বরের নিকটতর এবং ঈশ্বরীয় জ্ঞানের প্রথম প্রকাশ, সেই হেতু ওঙ্কারই ঈশ্বরের প্রকৃত বাচক। আর সেই একমাত্র ‘অখণ্ড সচ্চিদানন্দ’ ব্রহ্মকে যেমন অপূর্ণ জীবাত্মাগণ বিশেষ বিশেষ ভাবে ও বিশেষ বিশেষ গুণযুক্তরূপে চিন্তা করিতে পারে, তেমনি তাঁহার দেহরূপ এই জগৎকেও সাধনের মনোভাব-অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্নরূপে চিন্তা করিতে হইবে।

উপাসকের মনে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটি গুণের যখন যেটি প্রবল থাকে, তখন তাহার মনে ঈশ্বর সম্বন্ধে তদনুযায়ী ভাবই উদিত হয়। ইহার ফল এই—একই ব্রহ্ম ভিন্ন ভিন্ন গুণপ্রাধান্যে দৃষ্ট হইবেন, আর সেই এক জগৎই ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিভাত হইবে। সর্বাপেক্ষা অল্প বিশেষভাবাপন্ন সার্বভৌম বাচক ওঙ্কারে যেমন বাচ্য ও বাচক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বন্ধ, তেমনি এই বাচ্য-বাচকের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ ভগবানের ও জগতের বিশেষ বিশেষ খণ্ডভাব সম্বন্ধেও খাটিবে। আর ইহার সবগুলিরই বিশেষ বিশেষ বাচক শব্দ থাকা আবশ্যক। মহাপুরুষদের গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতি হইতে উত্থিত এই বাচক শব্দসমূহ যথাসম্ভব ভগবান্ ও জগতের এই বিশেষ বিশেষ খণ্ডভাব প্রকাশ করে। ওঙ্কার যেমন অখণ্ডব্রহ্মের বাচক, অন্যান্য মন্ত্রগুলিও সেইরূপ সেই পরমপুরুষের খণ্ড-ভাবগুলির বাচক। ঐ সবগুলিই ঈশ্বরধ্যানের ও প্রকৃত জ্ঞানলাভের সহায়ক।

৩২ ‘যথা সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ ইত্যাদি।-ছান্দোগ্য উপ., ৬।১।৪

৩৩ অক্ষরাণামকারোঽস্মি।-গীতা, ১০।৩৩

৮. প্রতীক ও প্রতিমা-উপাসনা

এইবার প্রতীকোপাসনা ও প্রতিমাপূজার বিষয় আলোচনা করিব। প্রতীক অর্থে যে- সকল বস্তু ব্রহ্মের পরিবর্তে উপাসনার যোগ্য। প্রতীকে ভগবদুপাসনার অর্থ কি? ভগবান্ রামানুজ বলিয়াছেনঃ 'ব্রহ্ম নয়, এমন বস্তুতে ব্রহ্মবুদ্ধি করিয়া ব্রহ্মের অনুসন্ধানকে প্রতীকোপাসনা বলে।'৩৪ শঙ্করাচার্য বলিয়াছেনঃ 'মনকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিবে—ইহা আধ্যাত্মিক, আকাশ ব্রহ্ম—ইহা আধিদৈবিক। মন আধ্যাত্মিক প্রতীক, এবং আকাশ বাহ্য প্রতীক—এই উভয়কেই ব্রহ্মস্বরূপে উপাসনা করিতে হইবে। এইরূপ আদিত্যই ব্রহ্ম, ইহাই আদেশ...যিনি নামকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন—ইত্যাদি স্থলে প্রতীকোপাসনা সম্বন্ধে সংশয় হয়।'৩৫ প্রতীক শব্দের অর্থ—বাহিরের দিকে যাওয়া, আর প্রতীকোপাসন-অর্থে ব্রহ্মের পরিবর্তে এমন এক বস্তুর উপাসনা, যাহা একাংশে অথবা অনেকাংশে ব্রহ্মের খুব সন্নিহিত, কিন্তু ব্রহ্ম নয়। শ্রুতিতে বর্ণিত প্রতীকের ন্যায় পুরাণ-তন্ত্রেও বহু প্রতীকের বর্ণনা আছে। সমুদয় পিতৃ-উপাসনা ও দেবোপাসনা এই প্রতীকোপাসনার অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে।

এখন কথা এইঃ ঈশ্বরকে—কেবল ঈশ্বরকে উপাসনা করার নামই ভক্তি। দেব, পিতৃ অথবা অন্য কোন উপাসনা ভক্তি-শব্দবাচ্য হইতে পারে না। ভিন্ন ভিন্ন উপাসনা কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত; উহা উপাসককে কেবল কোন প্রকার স্বর্গভোগরূপ বিশেষ ফল প্রদান করে, কিন্তু উহাতে ভক্তির উদয় হয় না—উহা মুক্তিও দিতে পারে না। সুতরাং একটি কথা বিশেষরূপে মনে রাখা আবশ্যক। দার্শনিক দৃষ্টিতে পরব্রহ্ম হইতে জগৎকারণের উচ্চতম ধারণা আর হইতে পারে না; প্রতীকোপাসক কিন্তু অনেক স্থলে এই প্রতীককে ব্রহ্মের আসনে বসাইয়া উহাকে আপন অন্তরাত্মা বা অন্তর্যামিরূপে চিন্তা করেন, এরূপ স্থলে সেই উপাসক সম্পূর্ণ বিপথে চালিত হন, কারণ প্রকৃত প্রস্তাবে কোন প্রতীকই উপাসকের আত্মা হইতে পারে না। কিন্তু যেখানে ব্রহ্মই উপাস্য, আর প্রতীক কেবল উহার প্রতিনিধিস্বরূপ অথবা উহার উদ্দীপক কারণমাত্র, অর্থাৎ যেখানে প্রতীকের সহায়তায় সর্বব্যাপী ব্রহ্মের

উপাসনা করা হয়, প্রতীককে প্রতীকমাত্র না দেখিয়া জগৎকারণরূপে চিন্তা করা হয়, সেখানে এইরূপ উপাসনা বিশেষ উপকারী। শুধু তাই নয়, প্রবর্তকদিগের পক্ষে উহা একেবারে অনিবার্যরূপে প্রয়োজনীয়। সুতরাং যখন কোন দেবতাকে অথবা অন্য প্রাণীকে ঐ দেবতা বা প্রাণী-রূপেই উপাসনা করা হয়, তখন এরূপ উপাসনাকে একটি আনুষ্ঠানিক কর্মমাত্র বলা যাইতে পারে। আর উহা একটি 'বিদ্যা' বলিয়া উপাসক ঐ বিশেষ বিদ্যার ফল লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু যখন কোন দেবতা বা অন্য কেহ ব্রহ্মরূপে দৃষ্ট ও উপাসিত হন, তখন উহা সর্বনিয়ন্তা ঈশ্বরের উপাসনার সহিত তুল্য হইয়া পড়ে। ইহা হইতেই বুঝা যায়, অনেক স্থলে শ্রুতি, স্মৃতি—সর্বত্রই কোন দেবতা, মহাপুরুষ বা অন্য কোন অলৌকিক পুরুষের ব্যক্তিগত প্রকৃতি ভুলিয়া গিয়া তাঁহাদিগকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করা হয় কেন। ব্যাখ্যাস্বরূপে অদ্বৈতবাদী বলেন, 'নামরূপ বাদ দিলে সকল বস্তুই কি ব্রহ্ম নয়?' বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বলেন, 'সেই প্রভুই কি সকলের অন্তরাত্মা নন?' শঙ্কর তাঁহার ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে বলিয়াছেন, 'আদিত্যাদির উপাসনার ফল ব্রহ্মই দেন, কারণ তিনিই সকলের অধ্যক্ষ। যেমন প্রতিমাদিতে বিষ্ণু-আদি দৃষ্টি আরোপ করিতে হয়, তেমনি প্রতীকেও ব্রহ্মদৃষ্টি আরোপ করিতে হয়, সুতরাং এখানে প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মেরই উপাসনা করা হইতেছে বুঝিতে হইবে।' ৩৬

প্রতীক সম্বন্ধে যে-সকল কথা বলা হইল, প্রতিমা সম্বন্ধেও সেই-সকল কথা খাটিবে, অর্থাৎ যদি প্রতিমা কোন দেবতা বা সাধুসন্তের সূচক হয়, তাহা হইলে সেইরূপ উপাসনাকে ভক্তি বলা যাইবে না, সুতরাং উহা হইতে মুক্তিলাভ হইবে না। কিন্তু উহা সেই এক ঈশ্বরের সূচক হইলে উহার উপাসনায় ভক্তি ও মুক্তি—উভয়ই লাভ হয়। জগতের প্রধান প্রধান ধর্মগুলির মধ্যে বেদান্ত, বৌদ্ধধর্ম ও খ্রীষ্টধর্মের কোন কোন সম্প্রদায় সাধকদের সহায়তার জন্য অবাধে পূর্বোক্তভাবে প্রতিমার সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন; কেবল মুসলমান ও প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্ম এই সহায়তা অস্বীকার করেন। তাহা হইলেও মুসলমানেরা তাঁহাদের সাধুসন্ত ও শহীদগণের কবর অনেকটা প্রতীক বা প্রতিমারূপেই ব্যবহার করিয়া থাকেন। প্রোটেস্ট্যান্টরা ধর্মে বাহ্য সহায়তার আবশ্যকতা উড়াইয়া দিতে গিয়া ক্রমশঃ আধ্যাত্মিক ভাব হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িতেছেন, আর আজকাল খাঁটি

প্রোটেস্ট্যান্টের সহিত অগস্ত কম্‌তের চেলা বা নীতিমাত্র-প্রচারক ও অজ্ঞেয়বাদীদের কোন প্রভেদ নাই। আবার খ্রীষ্ট বা ইসলাম ধর্মে প্রতিমাপূজার যেটুকু অবশিষ্ট আছে, সেটুকুতে কেবল প্রতীক বা প্রতিমাই উপাসিত হয়, ব্রহ্মদৃষ্টিসৌকর্যার্থে নয়। সুতরাং উহা বড়জোর কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত মাত্র। অতএব উহা হইতে মুক্তি বা ভক্তিলাভ হইতে পারে না। এই প্রকার প্রতিমাপূজাতে সাধক সর্বনিয়ন্তা ঈশ্বর ভিন্ন অন্য বস্তুতে আত্মসমর্পণ করে, সুতরাং মূর্তি বা কবর, মন্দির বা স্মৃতিস্তম্ভের এইরূপ ব্যবহারই প্রকৃত পুতুলপূজা। কিন্তু তাহা হইলেও উহা কোন পাপকর্ম বা অন্যায় নয়, উহা একটি অনুষ্ঠান—একটি কর্মমাত্র; উপাসকেরা অবশ্যই উহার ফল পাইয়া থাকেন।

৩৪ অব্রহ্মণি ব্রহ্মদৃষ্ট্যাঽনুসন্ধানম্। রামানুজ ভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র, ৪। ১। ৫

৩৫ মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীতেত্যধ্যাত্মম্। অথাধিদৈবতমাকাশো ব্রহ্মেতি। তথা আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশঃ। স যো নামব্রহ্মেত্যুপাস্তে ইত্যেবমাদিষু প্রতীকোপাসনেষু সংশয়ঃ।-শাঙ্করভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র, ৪।১।৪। সংশয়ের উত্তর পরবর্তী সূত্রের ভাষ্যে প্রদত্ত হইয়াছে।

৩৬ ফলন্ত...আদিত্যাদ্যুপাসনেঽপি ব্রহ্মৈব দাস্যতি সর্বাধ্যক্ষত্বাৎ।...ঈদৃশং চাত্র ব্রহ্মণ উপাস্যত্বং যৎ প্রতীকেষু তদ্‌দৃষ্ট্যধ্যারোপণং প্রতিমাদিষু ইব বিষ্ণ্বাদীনাম্।-শঙ্করভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র ৪। ১। ৫

৯. ইষ্টনিষ্ঠা

এইবার ইষ্টনিষ্ঠা সম্বন্ধে আমাদিগকে আলোচনা করিতে হইবে। যে ভক্ত হইতে চায়, তাহার জানা উচিত, 'যত মত তত পথ'—তাহার জানা উচিত, বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় সেই একই ভগবানের মহিমার বিভিন্ন বিকাশমাত্র।

'হে ভগবান্, লোকে তোমাকে কত বিভিন্ন নামে ডাকিয়া থাকে—লোকে তোমাকে বিভিন্ন নামে যেন ভাগ করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু প্রত্যেকটি নামেই তোমার পূর্ণশক্তি বর্তমান। যে উপাসক যে নামে উপাসনা করিতে ভালবাসে, তাহার নিকট তুমি সেই নামের ভিতর দিয়াই প্রকাশিত হও। তোমার প্রতি অন্তরাত্মার ঐকান্তিক অনুরাগ থাকিলে তোমাকে ডাকিবার কোন নির্দিষ্ট কাল নাই। তোমার নিকট এত সহজে যাওয়া যায়, কিন্তু আমার দুর্দৈব—তোমার প্রতি অনুরাগ জন্মিল না।' ৩৭

শুধু তাই নয়, ভক্ত যেন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা জ্যোতির তনয়গণকে ঘৃণা না করেন; এমন কি তাঁহাদের সমালোচনা-বিষয়েও যেন বিশেষ সতর্ক থাকেন; তাঁহাদের নিন্দা শোনাও তাঁহার উচিত নয়। অবশ্য এমন লোক অতি অল্পই আছেন, যাঁহারা উদার, সহানুভূতিসম্পন্ন, অপরের গুণগ্রহণে সমর্থ, আবার গভীর ভগবৎ-প্রেমসম্পন্ন। সচরাচর দেখা যায়, উদারভাবাপন্ন সম্প্রদায়গুলি আধ্যাত্মিক গভীরতা হারাইয়া ফেলে। ধর্ম তাহাদের নিকট একপ্রকার রাজনীতিক-সামাজিক-ভাবাপন্ন সমিতির কার্যে পরিণত হয়। আবার খুব সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিগণের নিজ আদর্শের প্রতি খুব ভালবাসা আছে বটে, কিন্তু তাহাদের এই ভালবাসার প্রতিটি বিন্দু অপর সকল সম্প্রদায়ের—যেগুলির মতের সহিত তাহাদের এতটুকুও পার্থক্য আছে—সেগুলির উপর ঘৃণা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। ঈশ্বরেচ্ছায় জগৎ যদি পরম উদার অথচ গভীরপ্রেমসম্পন্ন জনগণে পূর্ণ হইয়া যাইত, বড় ভাল হইত! কিন্তু এইরূপ মহাত্মার সংখ্যা অতি বিরল। তথাপি আমরা জানি, জগতের অনেককে এই আদর্শে শিক্ষিত করা সম্ভব; আর ইহার উপায় এই 'ইষ্টনিষ্ঠা' ।

প্রত্যেক ধর্মের প্রতিটি সম্প্রদায় মানুষকে শুধু নিজের আদর্শটি দেখাইয়া দেয়, কিন্তু সনাতন বৈদান্তিক ধর্ম ভগবানের সেই মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার অনন্ত দ্বার খুলিয়া দেন, এবং মানবের সমক্ষে প্রায় অসংখ্য আদর্শ স্থাপন করেন। সেই আদর্শগুলির প্রত্যেকটিই সেই অনন্তস্বরূপের এক-একটি বিকাশ মাত্র। অতীত ও বর্তমানের মহামহিমময় ঈশ্বরতনয় বা ঈশ্বরের অবতারগণ মনুষ্যজীবনের বাস্তব ঘটনাবলীর কঠিন পর্বত কাটিয়া যে- সকল বিভিন্ন পথ বাহির করিয়াছেন, পরমকরুণাপরবশ হইয়া বেদান্ত উহা মুমুক্ষু নরনারীগণকে দেখাইয়া দেন, আর বাহু প্রসারিত করিয়া সকলকে—এমন কি ভবিষ্যৎ মানবকেও সেই সত্য ও আনন্দের ধামে আহ্বান করেন, যেখানে মানবাত্মা মায়াজাল হইতে মুক্ত হইয়া পূর্ণ স্বাধীনতা ও অনন্ত আনন্দের অবস্থায় উন্নীত হয়।

ভক্তিযোগ এইরূপে ভগবৎপ্রাপ্তির বিভিন্ন পথগুলির একটিকেও ঘৃণা বা অস্বীকার করিতে নিষেধ করেন। তথাপি গাছ যতদিন ছোট থাকে, ততদিন বেড়া দিয়া রাখিতে হয়। অপরিণত অবস্থায় নানাপ্রকার ভাব ও আদর্শ সম্মুখে রাখিলে ধর্মরূপ কোমল লতিকা মরিয়া যাইবে। অনেক লোক উদার ধর্মভাবের নামে অনবরত ভাবাদর্শ পরিবর্তন করিয়া নিজেদের বৃথা কৌতূহল মাত্র চরিতার্থ করে। নূতন নূতন বিষয় শোনা তাহাদের যেন একরূপ ব্যারাম—একরূপ নেশার ঝোঁকের মত। তাহারা খানিকটা সাময়িক স্নায়বীয় উত্তেজনা চায়, সেটি চলিয়া গেলেই তাহারা আর একটির জন্য প্রস্তুত হয়। ধর্ম তাহাদের নিকট যেন আফিমের নেশার মত হইয়া দাঁড়ায়, আর ঐ পর্যন্তই তাহাদের দৌড়। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেনঃ আর এক প্রকার মানুষ আছে, তাহারা মুক্তা-ঝিনুকের মত। মুক্তা-ঝিনুক সমুদ্রতল ছাড়িয়া স্বাতীনক্ষত্রে পতিত বৃষ্টি-জলের জন্য উপরে আসে। যতদিন না ঐ জলের একটি বিন্দু পায়, ততদিন সে মুখ খুলিয়া উপরে ভাসিতে থাকে, তারপর গভীর সমুদ্রতলে ডুব দেয় এবং যে পর্যন্ত না বৃষ্টিবিন্দুটি মুক্তায় পরিণত হয়, সে পর্যন্ত সেইখানেই বিশ্রাম করে।

এই উদাহরণে ইষ্টনিষ্ঠা-ভাবটি যেরূপ হৃদয়স্পর্শী কবিত্বের ভাষায় ফুটিয়া উঠিয়াছে আর কোথাও সেরূপ হয় নাই। ভক্তিপথে প্রবর্তকের এই একনিষ্ঠা একান্ত প্রয়োজন। হনুমানের

ন্যায় তাঁহার বলা উচিত, ‘যদিও লক্ষ্মীপতি ও সীতাপতি পরমাত্মস্বরূপে অভেদ, তথাপি কমললোচন রামই আমার সর্বস্ব।’৩৮ অথবা সাধু তুলসীদাস যেমন বলিতেন, ‘সকলের সঙ্গে বসো, সকলের সঙ্গে আনন্দ কর, সকলের নাম গ্রহণ কর; যে যাহাই বলুক না কেন সকলকেই হাঁ হাঁ বলো, কিন্তু নিজের ভাব দৃঢ় রাখিও’৩৯, ভক্তিযোগীরও সেই প্রকার আচার অবলম্বন করা উচিত। ভক্তসাধক যদি অকপট হন, তবে গুরুদত্ত ঐ বীজমন্ত্র হইতেই আধ্যাত্মিক ভাবের সুবৃহৎ বটবৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া শাখার পর শাখা ও মূলের পর মূল বিস্তার করিয়া ধর্মজীবনের সমগ্র ক্ষেত্র ছাইয়া ফেলিবে। পরিশেষে প্রকৃত ভক্ত দেখিবেন—যিনি সারা জীবন তাঁহার নিজের ইষ্টদেবতা, তিনিই বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভিন্ন নামে বিভিন্ন রূপে উপাসিত।

৩৭ নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি-
স্তত্রর্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ মমাপি
দুর্দৈবমীদৃশামিহাজনি নানুরাগঃ।। —শিক্ষাষ্টকম্, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
৩৮ শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্বস্বঃ রামঃ কমললোচনঃ।।
৩৯ সব্‌সে বসিয়া সব্‌সে রসিয়ে সব্‌কা লীজিয়ে নাম।
হাঁ জী হাঁ জী কর্‌তে রহিয়ে বৈঠিয়ে আপনা ঠাম।।—দোঁহা, তুলসীদাস

১০. ভক্তির সাধন

ভক্তিলাভের উপায় ও সাধনসম্বন্ধে ভগবান্ রামানুজ তাঁহার বেদান্তভাষ্যে লিখিয়াছেনঃ

‘বিবেক, বিমোক, অভ্যাস, ক্রিয়া, কল্যাণ, অনবসাদ্ ও অনুদ্ধর্ষ হইতে ভক্তিলাভ হয়।’ ‘বিবেক’ অর্থে রামানুজের মতে খাদ্যাখাদ্যবিচার। তাঁহার মতে খাদ্যদ্রব্যের অশুদ্ধির কারণ তিনটিঃ (১) জাতিদোষ অর্থাৎ খাদ্যের প্রকৃতিগত দোষ, যথা—রশুন, পেঁয়াজ প্রভৃতি স্বভাবতঃ অশুচি খাদ্যের যে দোষ; (২) আশ্রয়দোষ অর্থাৎ পতিত ও অভিশপ্ত ব্যক্তির হস্তে খাইলে যে দোষ; (৩) নিমিত্তদোষ অর্থাৎ কোন অশুচি বস্তুর, যথা-কেশ, ধূলি আদি সংস্পর্শজনিত দোষ। শ্রুতি বলেন, ‘আহার শুদ্ধ করিলে চিত্ত শুদ্ধ হয়, চিত্ত শুদ্ধ হইলে ভগবান্‌কে সর্ব্বদা স্মরণ করিতে পারা যায়।’ ৪০ রামানুজ ছান্দোগ্য উপনিষদ্ হইতে এই বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন।

এই খাদ্যখাদ্যবিচার ভক্তিমার্গাবলম্বিগণের মতে চিরকালেই একটি গুরুতর বিষয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। অনেক ভক্তসম্প্রদায় এ-বিষয়টিকে অত্যন্ত অস্বাভাবিক করিয়া তুলিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহার মধ্যে যে একটি গুরুতর সত্য নিহিত আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। আমাদের মনে রাখা উচিত, সাংখ্যদর্শনের মতে সত্ত্ব, রজঃ তমঃ—এই তিন গুণের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি, এবং বৈষম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইলে উহারাই জগদ্রূপে পরিণত হয়; এগুলি প্রকৃতির গুণ ও উপাদান দুই-ই; সুতরাং ঐ সকল উপাদানেই প্রত্যেকটি মানুষের দেহ নির্মিত। উহাদের মধ্যে সত্ত্বগুণের প্রাধান্যই আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষে অত্যাবশ্যক। আমরা আহারের দ্বারা শরীরের ভিতর যে উপাদান গ্রহণ করি, তাহাতে আমাদের মানসিক গঠনের অনেক সাহায্য হয়, সুতরাং আমাদিগকে খাদ্যাখাদ্যবিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় এ বিষয়েও শিষ্যেরা চিরকাল যে গোঁড়ামি করিয়া থাকে, তাহা যেন আচার্যগণের উপর আরোপিত না হয়।

বাস্তবিক খাদ্যের শুদ্ধি-অশুদ্ধি বিচার গৌণমাত্র। পূর্বোদ্ধৃত ঐ বাক্যটিই শঙ্কর তাঁহার উপনিষদ্ভাষ্যে অন্যরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ঐ বাক্যস্থ 'আহার' শব্দটি যাহা সচরাচর খাদ্য অর্থে গৃহীত হইয়া থাকে, তাহা তিনি অন্য অর্থে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মতে 'যাহা আহৃত হয়, তাহাই আহার। শব্দাদি বিষয়ের জ্ঞান ভোক্তার অর্থাৎ আত্মার উপভোগের জন্য ভিতরে আহৃত হয়। এই বিষয়ানুভূতিরূপ জ্ঞানের শুদ্ধিকেই 'আহারশুদ্ধি' বলে। সুতরাং আহারশুদ্ধি অর্থে আসক্তি-দ্বেষ- বা মোহ-শূন্য হইয়া বিষয়ের জ্ঞান আহরণ। সুতরাং এইরূপ জ্ঞান বা 'আহার' শুদ্ধ হইলে এইরূপ ব্যক্তির সত্ত্ব অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয় শুদ্ধ হইয়া যাইবে। সত্ত্বশুদ্ধি হইলে অনন্ত পুরুষের যথার্থ স্বরূপজ্ঞান ও অবিচ্ছিন্ন স্মৃতি আসিবে।' ৪১

শঙ্কর ও রামানুজের ব্যাখ্যা দুইটি আপাতবিরোধী বলিয়া বোধ হইলেও উভয়টিই সত্য ও প্রয়োজনীয়। সূক্ষ্ম শরীর বা মনের সংযম স্থূল শরীরের সংযম হইতে উচ্চতর কাজ বটে, কিন্তু সূক্ষ্মের সংযম করিতে হইলে অগ্রে স্থূলের সংযম বিশেষ আবশ্যক। অতএব আহার সম্বন্ধে গুরুপরম্পরা যে-সকল নিয়ম প্রচলিত আছে, প্রবর্তকের পক্ষে সেগুলি পালন করা আবশ্যক। কিন্তু আজকাল ভারতীয় অনেক সম্প্রদায়ে এই আহারাদি বিচারের এত বাড়াবাড়ি, এত অর্থহীন নিয়মের বাঁধাবাঁধি, এত গোঁড়ামি দেখা যায় যে, মনে হয় ধর্ম যেন রান্নাঘরে আশ্রয় লইয়াছে। কখন যে ধর্মের মহান্ সত্যসমূহ সেখান হইতে বাহির আসিয়া আধ্যাত্মিকতার সূর্যালোকে উদ্ভাসিত হইবে, তাহার কোন সম্ভবনা নাই। এরূপ ধর্ম একপ্রকার জড়বাদমাত্র। উহা জ্ঞান নয়, ভক্তি নয়, কর্মও নয়। উহা এক বিশেষ প্রকার পাগলামি মাত্র। যাহারা এই খাদ্যাখাদ্যের বিচারকেই জীবনের সার বলিয়া স্থির করিয়াছে, তাহাদের গতি ব্রহ্মলোকে না হইয়া সম্ভবতঃ বাতুলালয়ের দিকেই হইবে। সুতরাং ইহা যুক্তিসিদ্ধ বোধ হইতেছে যে, খাদ্যাখাদ্যের বিচার মনের স্থিরতারূপ উচ্চাবস্থালাভের জন্য কিছুটা আবশ্যক, অন্যথা এই স্থিরতা সহজে লাভ করা যায় না।

তারপর 'বিমোক' । বিমোক অর্থে ইন্দ্রিয়গুলির বিষয়াভিমুখী গতি নিবারণ ও উহাদিগকে সংযত করিয়া নিজ ইচ্ছার অধীনে আনয়ন এবং ইহা সকল ধর্মসাধনেরই কেন্দ্রীয় ভাব।

তারপর 'অভ্যাস' অর্থাৎ আত্মসংযম ও আত্মত্যাগের অভ্যাস। কিন্তু সাধকের প্রাণপণ চেষ্টা ও প্রবল সংযমের অভ্যাস ব্যতীত ঈশ্বর ও আত্মবিষয়ক অনুভূতি কখনই সম্ভব নয়। মন যেন সর্বদাই সেই ঈশ্বরের চিন্তায় নিবিষ্ট থাকে। প্রথম প্রথম ইহা অতি কঠিন বোধ হয়, কিন্তু অধ্যবসায়-সহকারে চেষ্টা করিতে করিতে এরূপ চিন্তা করার শক্তি ক্রমশঃ বর্ধিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন, 'হে কৌন্তেয়, অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মন নিগৃহীত হইয়া থাকে।' ৪২

তারপর 'ক্রিয়া' অর্থাৎ যজ্ঞ। পঞ্চ মহাযজ্ঞের নিয়মিতরূপ অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

'কল্যাণ' অর্থে পবিত্রতা, আর এই পবিত্রতারূপ একমাত্র ভিত্তির উপর ভক্তিপ্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত। বাহ্যশৌচ অথবা খাদ্যাখাদ্য-সম্বন্ধে বিচার—এ উভয়ই সহজ, কিন্তু অন্তঃশুদ্ধি ব্যতিরেকে উহাদের কোন মূল্য নাই। রামানুজ অন্তঃশুদ্ধিলাভের উপায়স্বরূপ নিম্নলিখিত গুণ গুলির কথা বর্ণনা করিয়াছেনঃ সত্য, আর্জব—সরলতা, দয়া—নিঃস্বার্থ পরোপকার, দান, অহিংসা—কায়মনোবাক্যে অপরের হিংসা না করা, অনভিধ্যা—পরদ্রব্যে লোভ, বৃথা চিন্তা ও পরকৃত অনিষ্টাচারণের ক্রমাগত চিন্তা-পরিত্যাগ। এই তালিকার মধ্যে অহিংসা গুণটির সম্বন্ধে বিশেষভাবে কিছু বলা আবশ্যক। ভক্তকে সকল প্রাণিসম্বন্ধে এই অহিংসাভাব অবলম্বন করিতেই হইবে। কেহ কেহ মনে করেন, মনুষ্যজাতির প্রতি অহিংসাভাব পোষণ করিলেই যথেষ্ট, অন্যান্য প্রাণিগণের প্রতি নির্দয় হইলে কোন ক্ষতি নাই; অহিংসা বাস্তবিক তাহা নয়। আবার কেহ কেহ যেমন কুকুর-বিড়ালকে লালন পালন করেন বা পিপীলিকাকে চিনি খাওয়ান, কিন্তু মানুষ-ভ্রাতার গলা কাটিতে দ্বিধা বোধ করেন না, অহিংসা বলিতে তাহাও বুঝায় না। বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি মহৎ ভাবই শেষ পর্যন্ত

বিরক্তিকর হইয়া যাইতে পারে, ভাল রীতিনীতিও যদি অন্ধভাবে অনুষ্ঠান করা হয়, তবে শেষ পর্যন্ত সেগুলিও অকল্যাণের কারণ হইয়া দাঁড়ায় এবং দুঃখের বিষয়, অহিংসানীতিও

এ নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। কতকগুলি ধর্মসম্প্রদায়ের অপরিষ্কার সাধকেরা স্নান করে না, পাছে তাহাদের গায়ের পোকা মরিয়া যায়, কিন্তু সেজন্য তাহাদের

মিসিং

অনুষ্ঠানগুলিকে মরণ-কামড়ে ধরিয়া থাকে, কোনমতে ছাড়িতে চায় না। যদি ঐ অনুষ্ঠানগুলি আধ্যাত্মিক জীবনের পরিচায়ক হয়, তবেই উহাদের উপযোগিতা আছে বলিতে হইবে। প্রাণশূন্য হইলে উহাদিগকে নির্দয়ভাবে উৎপাটন করিয়া ফেলা উচিত।

'অনবসাদ' বা বল ভক্তিলাভের পরবর্তী সাধন। শ্রুতি বলেন, 'বলহীন ব্যক্তি তাঁহাকে লাভ করিতে পারে না।'৪৩ এখানে শারীরিক বা মানসিক উভয় প্রকার দৌর্বল্য লক্ষিত হইয়াছে। ' বলিষ্ঠ, দ্রঢ়িষ্ঠ'৪৪ ব্যক্তিই প্রকৃত শিষ্য হওয়ার উপযুক্ত। দুর্বল, শীর্ণকায়, জরাজীর্ণ ব্যক্তি কী সাধন করিবে? শরীর ও মনের মধ্যে যে অদ্ভুত শক্তিসমূহ লুক্কায়িত আছে কোনরূপ যোগাভ্যাসের দ্বারা তাহারা কিঞ্চিৎ পরিমাণে জাগ্রত হইলেও দুর্বল ব্যক্তি একেবারে খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইবে। যুবা, সুস্থকায়, সবল ব্যক্তিই সিদ্ধ হইতে পারেন। সুতরাং সিদ্ধি লাভের জন্য মানসিক বল যে পরিমাণে প্রয়োজন, শারীরিক বলও সেই পরিমাণে চাই। ইন্দ্রিয়সংযমের প্রতিক্রিয়া খুব সবল দেহই সহ্য করিতে পারে। অতএব ভক্ত হইতে যাঁহার সাধ, তাঁহাকে সবল ও সুস্থকায় হইতে হইবে। যাহারা দুর্বল তাহারা যদি কোনরূপ যোগাভ্যাসের চেষ্টা করে, তবে হয় তাহারা কোন দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধিগ্রস্ত হইবে, নতুবা মনকে ভয়ানক দুর্বল করিয়া ফেলিবে। ইচ্ছাপূর্বক শরীরকে দুর্বল করা ভক্তি-বা জ্ঞান লাভের অনুকূল ব্যবস্থা নয়।

যাহার চিত্ত দুর্বল, সেও আত্মলাভে কৃতকার্য হয় না। যে ভক্ত হইতে ইচ্ছুক, সে সর্বদা প্রফুল্ল থাকিবে। পাশ্চাত্যে অনেকের কাছে ধার্মিক এর লক্ষণ—সে কখনও হাসিবে না, তাহার মুখ সর্বদা বিষাদমেঘে আবৃত থাকিবে, তাহার চোয়াল বসা ও মুখ লম্বা হওয়া আবশ্যক। শুষ্কশরীর ও লম্বামুখ লোক ডাক্তারের তত্ত্বাবধানের যোগ্য বটে, কিন্তু তাহারা

কখনও যোগী হইতে পারে না। প্রফুল্লচিত্ত ব্যক্তিই অধ্যবসায়শীল হইতে পারে। দৃঢ়চেতা ব্যক্তিই সহস্র বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে। মায়াজাল ছিন্ন করিয়া বাহিরে যাওয়া–যোগ সাধন করা মহা কঠিন কার্য, দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন বীরগণের দ্বারাই ইহা সম্ভব।

৪০ আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধোঃধ্রুবা স্মৃতিঃ।–ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৭। ২৬২
৪১ আহ্রিয়তে ইত্যাহারঃ শব্দাদিবিষয়জ্ঞানম্ ভোক্তুর্ভোগায়াহ্রিয়তে। তস্য বিষয়োপলব্ধিলক্ষণস্য বিজ্ঞানস্য শুদ্ধিরাহারশুদ্ধিঃ রাগদ্বেষমোহদোষৈরসংসৃষ্টং বিষয়বিজ্ঞানামিত্যর্থঃ। তস্যামাহারশুদ্ধৌ সত্যাং তদ্বতোহন্তঃকরণস্য সত্ত্বস্য শুদ্ধির্নৈর্ল্যাং ভবতি; সত্ত্বশুদ্ধৌ চ সত্যাং যথাবগতে ভূমাত্মনি ধ্রুবাবিচ্ছিন্না স্মৃতিরবিস্মরণং ভবতি।–শাঙ্করভাষ্য, ছান্দোগ্য উপনিষদ, ৭। ২৬
৪২ অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে। –গীতা, ৬। ৩৫
৪৩ 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।' –মুণ্ডক উপ., ৩। ২। ৪
৪৪ আশিষ্ঠো দ্রঢ়িষ্ঠো বলিষ্ঠঃ।' –তৈত্তি. উপ., ২। ৮। ১